মুন্সী শেখ জমীরউদ্দিন

জীবন ও সাহিত্য

ম্মদ রবীউল আ

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন
জীবন ও সাহিত্য

মুহম্মদ রবীউল আলম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ঃ জীবন ও সাহিত্য
মুহম্মদ রবীউল আলম

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৮২৮
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২.৯৭
ISBN : 984—06—0295—X

প্রকাশকাল
জুন ১৯৯৪
আষাঢ় ১৪০১
মুহররম ১৪১৫

প্রকাশক
এম. আতাউর রহমান
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাক–১০০০

প্রচ্ছদ
কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুনসুর-উদ্-দৌলা পাহ্‌লোয়ান
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ ৩৩.০০ টাকা

MUNSHI SHEIKH JAMIRUDDIN : JIBON O SAHITAYA (Munshi Sheikh Jamiruddin : Life and Literature) : written by Muhammad Rabiul Alam in Bengali and published by Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000.

June 1994

Price : Tk 33.00 ; US Dollar : 1.75

মহাপরিচালকের কথা

ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মুসলিম পুনর্জাগরণে যে ক'জন মনীষী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ দেশের মুসলমানরা যখন ইতিহাস-ঐতিহ্য বিস্মৃত, সামাজিক ক্ষেত্রে অবহেলিত তখন খৃস্টান পাদ্রীরা তাদেরকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করে বিপথগামী করে তুলেছিলেন। এরূপ এক সময়ে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে বিপথগামী মুসলমানদেরকে বিপথগামিতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করেন।

শেখ জমিরুদ্দিন তাঁর ঘটনাবহুল জীবন-চলাচলে নিজেও একদিন ধোঁকা ও ভাঁওতাবাজির আশ্রয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দিনরূপে পরিচিত হন। কিন্তু পরে তাঁর ভুল ও বিভ্রান্তি অপসারিত হ'লে তিনি পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, উৎকর্ষসহ বৈশিষ্ট্য প্রচারে আত্মোৎসর্জ্জন করেন। তাঁর লেখনী ও বক্তৃতায় মুসলিম সমাজে নতুনভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ক্ষণজন্মা এই মনীষীর জীবন ও সাহিত্য-কর্ম বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এইরূপ একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশে সক্ষম হওয়ায় একান্তভাবেই আনন্দিত ও গর্বিত। আশা করি, গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু রস-চিত্তের প্রয়োজন মেটাতে এবং আনন্দ বিধানে সক্ষম হব।

প্রকাশকের কথা

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্‌র সমসাময়িক। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ধোঁকায় পড়ে নিজেও একদিন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। তখনকার ইতিহাস-ঐতিহ্য বিস্মৃত মুসলিম সমাজের উদ্ধারকল্পে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। এ কারণে বর্তমান মুসলিম সমাজের পক্ষে তাঁর জীবন এবং লেখা সম্পর্কে জানা দরকার। এ উদ্দেশ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বইটি প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ্ রাসূল আলামীন আমাদের উদ্দশ্য সফল করুন। আমীন!!

সূচী

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন

জীবন ও সাহিত্য

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ঃ দেশ-কাল-সমাজ

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পলাশী প্রান্তরে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে বাংলার যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলো, তাতেই বাঙালি মুসলমানদের সর্বনাশী যাত্রার শুরু। পরবর্তী বহু বছর ধরে অতি ধীরগতিতে বিষ প্রয়োগের ন্যায় বাংলার মুসলমানদেরকে যন্ত্রণা দিতে দিতে একেবারে নিঃশেষিত অবস্থায় নিয়ে আসা হলো। বাংলার মুসলমানদের এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পতনের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক।

পলাশী যুদ্ধোত্তর সময়ে সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর বাংলায় নবাব হলেন বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লর্ড ক্লাইভ সর্বাধিনায়করূপে দেশের ভাগ্যবিধাতা হলেন। তারপর গিরিয়া, উদয়নালা ও বক্সারে মীর কাসিমের উপর্যুপরি পরাজয়ে (১৭৬৪ খৃঃ) চিরতরে বিলুপ্ত হলো বাংলার স্বাধীনতার শেষ-রশ্মি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে লর্ড ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা লাভ করলেন।[১] দেশ রক্ষা করার ভার পূর্ব থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে থাকলেও, এবার কোম্পানী আইনত দেশের প্রকৃত মালিক হলেন।

১৭৫৭ পরবর্তী দ্বৈতশাসনামলে মো. রিজা খাঁ বাংলায় এবং শিতাব রায় বিহারে 'নায়িব দিওয়ান' নিযুক্ত হয়ে যে অবস্থা ঘটালেন, তাতে দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।[২] এ দেশীয় ইতিহাসে তা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বাংলা, ১৭৬৯ খৃঃ) নামে খ্যাত। এই মন্বন্তরে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে মারা যায়। ওই দুর্ভিক্ষের এমন এক অপছায়া বাংলায় পড়েছিল যে, এ দেশের জনসাধারণ পরবর্তী বহুকাল

ধরে তাদের ব্যক্তিগত চিঠি–পত্রের খামে ৭৬ সংখ্যা লিখে ১১৭৬ সালে সংঘটিত বাংলার মন্বন্তরের ভয়াবহতা স্মরণ করতো। সে সময় বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এ ৭৬ একটি অভিশপ্ত সংখ্যায় পরিণত হয়েছিল। পত্রপ্রাপক ব্যতীত মাঝখান থেকে অন্য কেউ পত্র খুলে পড়লে, তার উপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কোটি কোটি মৃত ব্যক্তির অভিশাপ বর্ষণের ইশারা দিয়ে পত্র লেখক ৭৬ সংখ্যা তার পত্রের খামের উপর লিখে দিয়ে জনসাধারণকে ওই অভিশাপের কথাই জানিয়ে দিতো।

১৭৭২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসনকালে ইংরেজরা নানা পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। লর্ড হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিস এই সময়ে বাংলার লাট। ওই সময়ের গোড়ার দিকে মুর্শিদাবাদ থেকে কোলকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হলো।[৩] নবাব বৃত্তিভোগী হলেন এবং ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে বাংলার জনসাধারণের বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের উপর দ্বিতীয় অভিশাপ রূপে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলো। এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানরাই একচেটিয়াভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে অফিস–আদালত থেকে ফারসী ভাষা উঠিয়ে দেয়া হলো। এতে বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনও চিরতরে নিঃশেষ হলো।

এই ঘটনার প্রায় ৪০ বছর পূর্ব থেকেই ইংরেজগণ এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনে সচেষ্ট হন। চার্লস গ্রান্টই তার সর্ব প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি যা করতে পারেন নি, ইংরেজ মিশনারীরা তা সমাধা করেছিলেন। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীই সর্বাগ্রগণ্য। ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে কেরী কোলকাতায় আসেন এবং শ্রীরামপুরের ইংরেজ মিশনে যোগ দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সেখানে ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়। তারপর এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৮০০ খৃস্টাব্দে কোলকাতায় ফোর্ট

উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হলো এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' গঠিত হলো। ওই সময় সংস্কৃত কলেজও প্রতিষ্ঠিত হলো। এভাবে ইংরেজি শিক্ষা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইংরেজদের এরূপ ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ এ দেশীয় হিন্দুরা বিশেষভাবে গ্রহণ করলো। তারা ইংরেজদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অতি দ্রুত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগলো। ইংরেজ ও হিন্দুদের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজ গড়ে উঠলো। হিন্দুরা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী উর্ধ্বতন পদে চাকরির সুযোগ পেলো। কিন্তু মুসলমানরা এব্যাপারে অনেক পিছিয়ে পড়ে রইল। বিদেশী ভাষা ও ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ বশত ইংরেজদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও তাদের ভাষাকে অবহেলা করতে শুরু করলো। ইংরেজি শিক্ষায় তারা এগিয়ে তো আসলোই না বরং এ শিক্ষাকে ধর্মদ্রোহিতা বলে প্রচার শুরু করলো। তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত না করে তৎকালীন মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে লাগলো।

মুসলমানরা ইংরেজদের হাতে রাজ্যহারা হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে পড়লো। ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখতার ফলেই তারা হিন্দুদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এতো পিছিয়ে পড়লো যে, তার প্রভাব সমাজে এখনো লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে হিন্দুরা জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

এ সময়ে হিন্দু সমাজকে আশ্রয় করে প্রধানত কোলকাতা শহরে এক নবযুগের সূচনা লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উক্ত নবজাগরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। বিশেষ করে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় এ যুগের প্রবক্তারা বেশি করে মেতে উঠেছিলেন।

রামমোহনের ধর্মান্দোলন ও বিদ্যাসাগরের সংস্কার প্রচেষ্টা, ধর্মসভার রক্ষণশীলতা ও ব্রহ্মসভায় আধ্যাত্মিকতা, ইয়াং বেঙ্গলের বিদ্রোহ ও বঙ্কিম চন্দ্রের তত্ত্বদৃষ্টি—এসবের মূলে ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুন উপলব্ধি ক্রিয়াশালী ছিল। এরূপ চেতনা প্রকাশের মাধ্যম ছিল নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা গদ্য । বস্তুত এই ভাব আন্দোলনেই বাংলার সাহিত্য সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পেয়েছিল।

সমসাময়িক কালে উত্তর ভারতে কিংবা বাংলার গ্রামাঞ্চলে মুসলমানরাও ধর্ম সম্পর্কে একটা নতুন উপলব্ধিতে আলোড়িত হয়েছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন, তিতুমীর ও শরিয়ত উল্লাহর সংগ্রাম তারই প্রকাশ। এসব আন্দোলন রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। ইংরেজের নতুন রাজধানী থেকে দূরবর্তী এলাকায় আন্দোলন প্রসারিত হয়। উত্তর ভারতে এর বাহন ফারসী ও উর্দু ভাষা; কিন্তু বাংলাদেশে তা বিস্তৃতি লাভ করে প্রধানত বক্তৃতার মাধ্যমে । এ নিয়ে পুরানো ধারার পদ্য লেখাও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু নতুন পদে কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়নি। মুসলমানদের সামগ্রিক পশ্চাৎপদতা আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের বিচ্ছিন্নতা কিংবা বর্তমান সম্পর্কে তাদের পূর্ণ ধারণার অভাবের ফলেই হয়তো এসব আন্দোলন তাদের সমাজ জীবনে এতটা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

সে সময় এদেশীয় কয়েকজন সাহসী মুসলমান শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্ব-সমাজের পশ্চাৎপদতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। ১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার আপসমূলক প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষক মন্তব্য করেছেন, "এই দূরদর্শী মনীষীই প্রথম উপলব্ধি করলেন। হিন্দুরা যখন বৃটিশের সহযোগিতা করছেন। তখন মুসলমানদের এই বৃটিশ বিদ্বেষ, অসহযোগ ও সংগ্রাম এক আত্মধ্বংসী কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। এই

সর্বনাশ থেকে উদ্ধারের উপায় হিসেবে বৃটিশপ্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য তিনি মুসলিম সমাজে প্রচারণা চালাতে লাগলেন। তাঁর মতবাদ মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজে অভিনন্দিত হল।" তখন থেকেই মুসলিম সমাজ তাদের আচরণে বৃটিশ বিদ্বেষ ত্যাগ করে এবং অভিমান ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। তবে মুসলমানদের মধ্যে অনগ্রসরতার ফলে এই চেতনা কার্যকর হতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটে। তৎকালীন মুসলমান মনীষীবৃন্দ ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে নবাব আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' নামে এক সাহিত্য সমিতি গঠন করেন। মুসলমানগণ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ও স্বকীয় অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করুক, এই ছিল সমিতির উদ্দেশ্য। এসব প্রচেষ্টার ফলেই দেখা যায় মুসলমানরা বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে একান্তই তৎপর হয়ে ওঠে এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের আত্মনিয়োগ করার সময় থেকে তাঁদের রচিত সাহিত্যে দুটি ভিন্নধর্মী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। একদল লেখক ছিলেন যাঁরা গতানুগতিক বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী তাঁরা হিন্দুরচিত বাংলা সাহিত্যের আদর্শ অবলম্বনে সাহিত্য সাধনা করে হিন্দুদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করেছেন—তাঁরা সমন্বয়পন্থী, অন্যদিকে একদল সাহিত্যিক মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যের কথা অনুভব করেছেন, তাঁরা স্বাতন্ত্র্যপন্থী। তাই সাহিত্যাঙ্গনেও সমন্বয়ধর্মী এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী—এই দুই বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে দুই ধারা প্রবাহিত হতে দেখা যায়। বস্তুত পক্ষে মীর মশাররফ হোসেনই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সার্থকতর মুসলমান সাহিত্যিক হিসাবে পথিকৃৎ। প্রচলিত ধারণায় মীর মশাররফ হোসেনকে প্রথম মুসলমান গদ্য

রচনাকারী হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হলেও তাঁর পূর্বে 'হাড় জ্বালানী' গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেন, 'উচিত শ্রবণ' গ্রন্থের লেখক খোন্দকার সামসুদ্দিন মুহাম্মদ সিদ্দিকী এবং 'কড়ির মাথায় বড়োর বিয়ে' গ্রন্থের লেখক শেখ আজিমুদ্দিন—এ ক'জন সাহিত্যিককে পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে সৃষ্ট আধুনিক সাহিত্যের ধারাটি অনুসরণ করলেন মীর মশাররফ হোসেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিক যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে তা অনুসরণ করে মুসলমান সাহিত্যিকগণ পাশ্চাত্য প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে মুসলমানদের অনুসৃত এই ধারার বিশেষ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই এ ধারার অনুসারী মুসলমান সাহিত্যিকগণকে সমন্বয়পন্থী নামে অভিহিত করা হয়।

মুসলমান সাহিত্যিকদের সমন্বয় সাধনের এই পন্থা ছিল মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টি প্রসূত। দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের মুসলমানরা বাঙালিরূপেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের মাধ্যমে যে ধারার যাত্রা শুরু এবং কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকের মধ্য দিয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা অনুসৃত। ইংরেজ জাতি ও ইংরেজি ভাষার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি শতাব্দিকালের পরে কিছু পরিবর্তিত হলে মুসলমান সমাজও ক্রমেই সাহিত্য সাধনায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে উদ্বুদ্ধ হিন্দু লেখকরা এ ক্ষেত্রে অগ্রণী থেকে গেলেন। তবে সমন্বয়পন্থী মুসলমান লেখকরা তাঁদের নৈকট্য অনুভব করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের অনুসৃত অপর ধারা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বলে চিহ্নিত। বস্তুত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম

জাতীয়তার উৎপত্তি এখন থেকেই ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে এই স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখক গোষ্ঠীর আবির্ভাব। 'সুধাকর'কে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ের সাহিত্যিকগণ সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলে তারা 'সুধাকর দল' নামে চিহ্নিত। তাঁদের রচিত সাহিত্যকে স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়। এই দলটির পশ্চাতে একটি ধর্মীয় অনুভূতি কার্যকরী ছিল। তবে তাঁরা কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। নিজেদের অনগ্রসরতা বিদূরিত করার জন্য তাঁরা ছিলেন স্বাতন্ত্র্যকামী। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁরা দেখাননি।

মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বোধ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক অবস্থা কার্যকরী ছিল। উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সংক্রামিত হয়, উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে মুসলমানদের মধ্যেও তা অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে অসংখ্য মুসলমান অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহের কারণে স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। মুসলমান সমাজের বুনিয়াদী এবং রুজি-রোজগারের ব্যবস্থাতো বিপর্যস্ত হয়েই ছিল, ধর্মীয় নৈতিক জীবনেও ব্যাপক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল। স্বধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অন্য ধর্মের মোহময় প্রচার তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে শিথিল করে দিয়েছিল। ধর্ম বিগর্হিত রীতিনীতি, পরধর্মের অনুকরণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্তর গ্রহণের সংবাদ শিক্ষিত মুসলমানদের বিচলিত করে তুলেছিল।[৪] প্রদেশের মুসলমান প্রধান জনপদসমূহে, বিশেষত যশোর, বরিশাল, ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে মিশনারী প্রচারণা ক্রমে তীব্র ও ব্যাপকতা লাভ করে। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ এ সম্পর্কে বলেছেন, "এই সময়ে আমরা শুনিতে পাইলাম ধর্মালোচনার অভাবে বঙ্গদেশের নানা জেলার বহু মুসলমান খৃস্ট, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বন করিয়া হাটে মাঠে ইসলাম ধর্মের

বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।..........২৪ পরগণা, বশিরহাট এবং খুলনা সাতক্ষীরা এলাকার কতিপয় লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে বনগাঁয়ের একজন উকিল ও দাস গফ্‌ফারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকায় জালালউদ্দিন নামক এক ব্যক্তিও ইতিপূর্বে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন পূর্বক ঢাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদিগের ভয়ে জলপাইগুড়িতে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাও শুনিলাম, রংপুর জেলার কোন গ্রামবাসী কতকগুলি মুসলমান খোল-করতাল যোগে হরিস, কীর্ত্তন করে, নিরামিষ খায়, হিন্দুর মতো মুসলমানের কোন কিছু দৃষ্ট হয় না।"[৫]

এ সময় বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কিত সাহিত্য রচনার মূলে খৃস্টান মিশনারীদের বিরূপ প্রচারণা অনেকখানি কাজ করেছিল। খৃষ্ট ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ কেবল যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, তা নয়। ইসলামের বিরুদ্ধেও তাঁরা বেশ শক্তিশালী আক্রমণ চালিয়েছিল বক্তৃতা এবং আলোচনার মাধ্যমে। মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে কতকগুলো বইপত্র তাঁরা রচনা করেন। যেমন: Prophote Testimony of christ, Muhammeden Ceremonies-এবং Reasons for not being a Musalman ইত্যাদি। মিশ্র ভাষারীতি বাংলা মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় বলে সেই ভাষায়ও তাঁরা কোন কোন বইপত্র লেখেন, সাধু ভাষায় তাঁদের রচনার নমুনা, জে লঙ প্রণীত মুহম্মদের জীবন চরিত্র (১৮৫৫) । এতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মৃগীরোগী, কুরআন রচয়িতা, কামুক ও সাংসারিক সুখান্বেষী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদের সহধর্মিনিগণ সম্পর্কেও অশ্রদ্ধাবাচক উক্তি আছে, পাদরী জি. এইচ. রাউসের ফোরকান (দ্বিঃ সঃ ১৮৮৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ পুস্তিকায় তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, কুরআন ঐশী রচনা নয়।

এ ধরনের বিভিন্ন বইপত্র প্রকাশ ও প্রচারণা চালিয়ে খৃস্টান মিশনারীরা এদেশীয় অসংখ্য মুসলমানকে খৃষ্ট ধর্মভুক্ত করতে লাগলো। এ সময় মিশনারী প্রচারণার বিরুদ্ধে মুসলিম প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ কিছু পরিমাণে ঘটেছিল। তবে তা আন্দোলনের আকার ধারণ করে আরো অর্ধ শতাব্দিকাল পরে। দেখা গেছে, বিশেষ করে মধ্যবঙ্গের মুসলিম প্রধান অঞ্চলে মিশনারীদের প্রচার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে প্রতিরোধ সংগঠনের সূত্রপাত হয় সেই অঞ্চলেই। ঊনবিংশ–বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে এই প্রতিরোধ আন্দোলনের উদ্গাতা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ও মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ।

মুসলিম বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই দুই ব্যক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই কর্মী পুরুষ সেদিন বাংলা–আসামের প্রায় সর্বত্র অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যুগব্যাপী সুপ্ত মুসলিম সমাজ যখন জড়তায়, আলস্য, মানসিক বিকাশ এবং কর্মোদ্যোগের অভাবে জীবন্মৃত, সেই অন্ধকার প্রহরে জাগরণের মশাল হাতে মেহের উল্লাহ ও জমিরুদ্দিনের আবির্ভাব। এই কাল পর্ব ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক। তাঁরা বাংলা ও আসামের গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওয়াজের মাধ্যমে সেদিন মিশনারীদের প্রচারকে ব্যর্থ করে মুসলিম জনমনে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা প্রসারের কাজ হাতে নিয়েছিলেন।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতে বসেছি। প্রায় অর্ধ–শতাব্দিকাল তিনি গ্রাম বাংলার মুসলিম জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তাই বাঙালি মুসলমানদের তৎকালীন বিভিন্ন আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয়ের কাজে তাঁর জীবন কথা ও কর্ম সাধনার বিশ্লেষণ বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

পাদটীকা

১. ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক– মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা–১৯৫৫ সাল।

২. পূর্বোক্ত।

৩. পূর্বোক্ত।

৪. ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, দ্বিতীয় সংস্করণ, রাজশাহী, পৃষ্ঠা ২২১।

৫. পূর্বোক্ত।

বাল্যকাল ও কর্মজীবন

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান মেহেরপুর) জেলার গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামে ১২৭৭ সালের (১৮৭০ খৃষ্টাব্দ) ১৫ মাঘ সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম শেখ আমির উদ্দিন এবং পিতামহের নাম শেখ বাকের উদ্দিন। তাঁর পিতা ও পিতামহের এ অঞ্চলে বেশ নামডাক ছিল।

শিশু জমিরুদ্দিন ৫ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব খানায় ভর্তি হলেন।[২] শেখ আমির উদ্দিনের এক বন্ধু ছিলেন এই মাদ্রাসার মওলানা। এই মওলানা সাহেব জমিরুদ্দিনকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। শিশু জমির কায়দা ও আমপারা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে কুরআন শরীফ ধরলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে শুরু করলেন।[৩] শিশু বয়সে রোযা রাখতে অভ্যাস করতে লাগলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ইসলাম ধর্মের সাধারণ বিষয়াবলী আয়ত্ত করে ফেল্লেন। ওস্তাদের দেওয়া নির্দেশ অনুসারে ভালভাবে লেখাপড়া করতে লাগলেন। মাদ্রাসা ছাড়াও গ্রামের সর্বত্র সুনাম ছড়িয়ে পড়লো।

স্কুলে ওস্তাদ কাছে কোশেশ করিয়া
লেখাপড়া শিখিতে লাগিল দেল দিয়া।।
জেহেন আছিল তেজ তাহার কারণে
যাহা ধরে তাই শেখে ভোলে না জীবনে।।
করিতে লাগিল খুব ওস্তাদ পিয়ার
গেরামেতে নাম বড়া হইল তাহার।[৪]

মাদ্রাসার মওলানা সাহেব তাঁকে নিয়ে গর্ব করতেন। প্রায়ই বলতেন, জমিরুদ্দিনের প্রতিভা আছে। তাঁর প্রতিভার একদিন বিকাশ হবেই। এক সময় জমিরুদ্দিনের মক্তব জীবন শেষ হলো।

তারপর তাঁকে বাংলা ও ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্যে পাশের গ্রাম আমঝুপিতে যেতে হলো। দু'মাইল দূরে আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তিনি। খালি পায়ে এক হাঁটু ধূলোপূর্ণ অথবা কাদাপূর্ণ রাস্তা পেরিয়ে প্রতিদিন যেতে হতো এই বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র তেমন ছিল না। প্রায় সকলেই হিন্দু। দু'-একজন অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্রও ছিলো। এই স্কুলে এসে তিনি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রদের সাথে মেশার সুযোগ পেলেন।

বিচার করিল মর্দ দেলে আপনার।
বাংলা এলেম যদি হইল লাভ কার
ইংরেজী বাদশার ভাষা আজিকার কালে।
কদর না বাড়ে কারো তাহা না শিখিলে।।
তাহার সবরে তিনি জমিরুদ্দিনেরে।
ভেজিলেন আমঝুপি স্কুল মাঝারে।[৫]

বালক জমিরুদ্দিন আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। এই বিদ্যালয়ের পর তিনি প্রথমে বঙ্গ বিদ্যালয়ে[৬] এবং পরে মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন।[৭] মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে জমিরুদ্দিন বেশ কিছুদিন পড়েন। এখানে বালক জমিরুদ্দিনের বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় তিনি জেলা সদর কৃষ্ণনগর চলে যান। কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের বেশ নাম ছিল। মেধাবী ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করতো। বালক জমির সে স্কুলে ভর্তি হলেন।[৮] এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা অনেক। বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রছাত্রী সেখানে পড়াশুনা করতো। সেখানকার পড়ার পরিবেশ তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তাঁর জীবনে এ স্কুলের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এ স্কুল থেকেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে জমিরুদ্দিন একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে ইতিমধ্যে নাম করে ফেলেছেন। নিজ ক্লাস ও অন্যান্য ক্লাসের মেধাবী ছাত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভাল। তিনি তাদের সাথে খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনা করতেন। জমিরুদ্দিন এ সময়ে স্কুলের পাশের হস্টেলে থাকতেন। হস্টেলে তাঁর রুমে তাঁর অনেক বন্ধু-বান্ধব আসতেন এবং জমিরুদ্দিন নিজেও তাদের বাড়িতে যেতেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হতো—কখনো ক্লাসের পড়াশুনা, স্কুলের পরিবেশ, শিক্ষকের ব্যবহার, কখনো হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা। জমিরুদ্দিনের বাল্য জীবনের একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানতে দারুণ আগ্রহী ছিলেন। তিনি অবাধে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের সাথে মিশতেন, তাদের বাসায় যেতেন, তাদের খাবার খেতেন, তাদের ধর্ম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন। ধর্মের কোন বিষয় বুঝতে না পারলে তাদের কাছে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতেন।

ঠিক সে সময়ের এক ঘটনা। খৃষ্টানদের সেদিন বড়দিনের উৎসব চলছিল। খৃষ্টানদের গির্জাগুলো সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড় । শুধু খৃষ্টান নয়, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকজনও সেখানে হাজির। জমিরুদ্দিন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে গেলেন বড়দিনের উৎসব দেখতে। এই উৎসব দেখতে গিয়ে তাঁর অনেক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো। তিনি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গির্জা ঘুরে ঘুরে দেখেন। সে উপলক্ষে আয়োজিত মেলা-বাজার পরিদর্শন করেন। এ সময়ে জমিরুদ্দিনের সাথে জনৈক মিশনারীর আলাপ হয়। তিনি তাঁর কাছে তাঁদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁদের বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। জমিরুদ্দিনের কথায় তিনি খুব খুশি হন এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরে জমিরুদ্দিনের সাথে তিনি আলাপ করেন। আলাপ শেষে তিনি তাঁকে আবার দেখা করতে বলেন। তারপর প্রায়ই জমিরুদ্দিন তাঁদের কাছে যেতেন। মিশনারীরা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁরা বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ

পড়তে দিতেন। তার মধ্যে ছিল 'বাইবেল', 'ইসলাম দর্শন', 'Testimony of Christ', 'Muhammeden Ceremonies,' 'Reasons for not being a Musalmans', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সব গ্রন্থ তিনি পড়তে থাকেন এবং যেগুলো বুঝতে না পারতেন, সেগুলো তাদের কাছ থেকে বুঝে নিতেন। মুন্সীজীর নিজের ভাষায়, "যে যে স্থানে বুঝিতে না পারিতাম, সেই সেই স্থানে পেনসিল দিয়া চিহ্ন করিয়া রাখিতাম এবং সময় ও সুযোগ অনুসারে মিশনারীদের নিকট যাইয়া বুঝিয়া লইতাম । আমি যখন উক্ত পুস্তকগুলি তাহাদের নিকট বুঝিয়া লইতে যাইতাম তখন তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন ও অতি যত্নের সহিত বুঝাইয়া দিতেন।"[১] এ সব গ্রন্থ পড়তে পড়তে গ্রন্থের বিষয়বস্তু বালকের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো এবং গ্রন্থগুলো তাঁর কাছে মহামূল্যবান বলে মনে হলো। গ্রন্থগুলোতে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনার মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে বড় করে দেখানো হয়েছে। খৃস্ট সমাজভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁর মনে হতে লাগলো এবং তিনি খৃস্ট ধর্মের প্রতি বেশ ঝুঁকে পড়লেন। তিনি মনে করলেন, পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্ম সত্য, তা হলো খৃস্ট ধর্ম। খৃস্ট ধর্মে বলা হয়েছে, ব্যাপ্টিস্ট না হলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। এই বিশ্বাসে তিনি ব্যাপ্টিস্ট হতে চাইলেন। তিনি একদিন মিশনারীদের কাছে গিয়ে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন।

তাঁরা খুব খুশি হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য তাঁকে জানালেন। তাঁকে তারা আরো কিছু বই দিলেন এবং আরো কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। কারণ তাঁর বয়স তখন খুব কম এবং মিশনারীরা চাইলেন জমিরুদ্দিনের খৃস্টান হওয়ার ইচ্ছাটা আরো শক্তিশালী হোক। মিশনারীরা তাই মাঝেমধ্যে তাঁর হস্টেলে এসে তাকে উপদেশ দিতেন। তিনি তাঁর জীবনবৃত্তান্তে লিখেছেন, "এই সময়ে আমার হৃদয় মধ্যে এই অমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে,

দীন ইসলাম মিথ্যা ও খৃস্টধর্ম সত্য। খৃস্ট পাপীর প্রায়শ্চিত করেছেন, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) পাপীর প্রায়শ্চিত করেন নাই।"[১০]

জমিরুদ্দিন আবার গেলেন। মিশনারীদের কাছে ব্যাপ্টিস্ট হবার ইচ্ছা প্রকাশ করার জন্য। মিশনারীরা এবার তাঁকে আর ফিরালেন না। তাঁরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর খৃস্টধর্ম গ্রহণের একটি দিন স্থির করে দিলেন। জমিরুদ্দিন তাদের ব্যবহারে ও কথায় খুব খুশি হলেন। তিনি মনে মনে আনন্দে নেচে উঠলেন। বন্ধু-বান্ধবদের জানালেন তিনি এ সব কথা। অধিকাংশ বন্ধু এ কথা শুনে জমিরুদ্দিনকে খৃস্টান হতে মানা করলেন। ইতিমধ্যে গাড়াডোব বাহাদুরপুরে এই খবর চলে গেছে। এ সংবাদ পিতা শেখ আমির উদ্দিনকে রাগিয়ে তুললো। তিনি ছুটে গেলেন কৃষ্ণনগরে ছেলের কাছে। জমিরুদ্দিন নিজেই এব্যাপারে লিখেছেন, "আমার বাপ্তাইজ হবার কথা আমার বাটিস্থ লোক জানিতে পারিয়া অতীব দুঃখিত হন। আমাকে বাটিতে ফিরাইয়া লইবার জন্য আমার নিকট গমন করেন। আমার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইত্যাদি অনেকেই আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আমার কিছুতেই তাহাদের কথায় প্রবোধ মানিল না; সুতরাং আমি তার বাটিতে ফিরিলাম না। আর কি ফিরিবার জো আছে? এদিকে যে মিশনারীদিগের মোহন মন্ত্র হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।"[১১] মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসে জমিরুদ্দিনকে অনুরোধ-উপদেশ করতে লাগলেন খৃস্টান না হওয়ার জন্য। মা-বাবা, ভাই-বোন চোখের পানি ফেললেন। তবু জমিরুদ্দিনের মনের কোন পরিবর্তন হলো না। তিনি খৃস্টান হবেনই। সব অনুরোধ উপদেশ কান্না ব্যর্থ হলো। শেখ আমির উদ্দিনকে ফিরে আসতে হলো। জমিরুদ্দিন তাঁর বাড়ি ফিরলেন না। মিশনারীদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তবে তিনি তাঁর জীবন বৃত্তান্তে বলেছেন, "এই সময়ে যদি আমি 'রদ্দে খৃস্টিয়ান' পুস্তক ও শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সদৃশ প্রচারক পাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় খৃস্টান হইতাম

না। অনন্তর অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া খৃষ্টান হওয়াই সিদ্ধান্ত করিলাম। স্নেহময়ী জননী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রিয় পিতা ও প্রাণসম ভ্রাতা কত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অন্যেরা কত নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেউ আমাকে এমন উপদেশ দিয়া বুঝাইতে পারিলেন না যে, খৃষ্ট ধর্ম মিথ্যা আর মুসলমান ধর্ম সত্য।"[১২] তিনি আরো লিখেছেন, "তখন যদি আমি বুঝিতে পারিতাম যে বাইবেল বিকৃত হইয়াছে। দুষ্ট খৃষ্টিয়ানেরা তাহার মধ্যে অনেক কথা যোগ ও বিয়োগ করিয়াছে। খৃষ্টিয়ান মিশনারী প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক নাস্তিক, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ব্যভিচারী, জাত্যাভিমানী, কটুভাষী আছে তাহা হইলে কখনও আমি বিকৃত খৃষ্ট ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না।" অবশেষে ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর রোববার অপরাহ্নে তিনি খৃষ্টান হলেন। পাদরী সলিভান সাহেব বালক জমিরুদ্দিনকে খৃষ্ট সমাজভুক্ত করান।[১৩]

শেখ জমিরুদ্দিন হলেন রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিন। অনেক নিন্দা, তিরস্কারের মধ্যে তিনি খৃষ্টান সমাজে গেলেন। বাড়ির সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের কাছে থাকতে লাগলেন। খৃষ্টান হওয়ার পরও তিনি বেশ কিছুদিন কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা করেন। এ স্কুলে কিছুদিন থাকার পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি মির্জাপুর বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে সার্বিক সাহায্য প্রদান করেন রেভারেন্ড জানে আলী এম. এ. (কেম্ব্রিজ) সাহেব। জমিরুদ্দিন তাঁর 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৩০৪) গ্রন্থে রেভারেন্ড জানে আলী সাহেবের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেছেন। মির্জাপুর বোর্ডিং স্কুলে জমিরুদ্দিন বেশ কিছুদিন ছিলেন। সেখানে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাব-চরিত্রে মিশনারীরা মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে তারা কাছে রাখতে চাইলেন। তারা তাঁকে মিশনের কাজে নিযুক্ত করবার জন্য চেষ্টা করলেন। মিশনারীরা তাঁদের ইচ্ছা

জমিরুদ্দিনকে জানালেন। তিনি রাযী হলেন না। তিনি এত তাড়াতাড়ি মিশনারী কাজে নিযুক্ত হতে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল অন্য কিছু। তিনি অনেক লেখাপড়া করবেন, বড় পন্ডিত হবেন। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা মিশনারীদের জানালেন। মিশনারীরা নিরাশ হলেন। জন জমিরুদ্দিন ভালভাবে লেখাপড়া করে যেতে লাগলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে মির্জাপুর বোর্ডিং স্কুলে শেষ পরীক্ষায় পাস করেন।

জমিরুদ্দিন স্কুল জীবন শেষ করলেন। আমঝুপি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বঙ্গবিদ্যালয়, মেহেরপুর ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুল ও মির্জাপুর বোর্ডিং স্কুলে তাঁর স্কুল জীবন অতিবাহিত হলো। এবার তিনি কলেজ জীবনে পদার্পণ করার উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে গেলেন। এলাহাবাদের সেন্টপল্‌স ডিভিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন তিনি।[১৪] এই কলেজে ভর্তি ও পড়াশুনার ব্যাপারে অন্যদের মধ্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন রেভারেণ্ড জানে আলী এম. এ (কেম্ব্রিজ) ও রেভারেন্ড বাটলার বি,এ।[১৫] এই প্রতিষ্ঠানে জন জমিরুদ্দিন তাঁর ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পেলেন। এই কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সুন্দর ব্যবহার, কলেজ লাইব্রেরীর অসংখ্য বইপত্র, বন্ধুবান্ধবদের মধুর ব্যবহার জমিরুদ্দিনের খুব ভাল লাগলো। এই কলেজে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাষা শিখতেন তিনি। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কলেজে থাকাকালীন মাত্র কয়েক বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক পান্ডিত্য অর্জন করেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা তিনি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন।

এলাহাবাদ সেন্টপল্‌স ডিভিনিটি কলেজে পড়াশুনা করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি সি, এম, এস, ক্যাথিড্রেল মিশন ডিভিনিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। এখানে তিনি খৃস্ট ধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্যে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন।[১৬] ১৮৯২ খৃস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মিশনারী পরীক্ষায়

২—

উত্তীর্ণ হয়ে H. G. R. (Higher Grade of Reader) বা পাঠকরত্ন উপাধি লাভ করেন।[১৭] জমিরুদ্দিনের H. G. R. উপাধিপত্রটি নিম্নরূপ ঃ

C. W. Society

N. W. P. Conference

It is hereby certified that Shaikh Zomiruddin having passed the examination for the higher grade of theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this conference for that office.

A. Stene
Chairman,

Allahabad
Dated 15th May, 1893

A. Hednight
Secretary'[১৮]

রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিন H. G. R. উপাধি পেলেন। মিশনারীরা তাঁর এই উপাধি পাওয়াতে খুব খুশি হলেন। অনেকে আসলেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। জমিরুদ্দিন তাঁদের আগমনে খুব খুশি হলেন। এবার তারা মিশনারী হিসেবে মিশনারী কাজে তাঁকে নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জমিরুদ্দিন রাজী হলেন তাদের কথায় । এবার তিনি হলেন পাদরী রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিন। তিনি মিশনারী হিসেবে প্রথমে কাজ আরম্ভ করলেন এলাহাবাদ মিশনে। এলাহাবাদ মিশনে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এবং খৃস্ট ধর্মের সপক্ষে বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় লিখতে শুরু করলেন। তিনি বক্তৃতা ও লেখনির দ্বারা অনেক মুসলমানকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। তিনি অদ্ভুত দক্ষতার সাথে মুসলমানদের খৃস্টান করতে পারতেন। তাঁর এই কৌশল মিশনারীরা দেখে অবাক হতেন। মিশনারী সমাজে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। কলকাতার মিশনারীরা তাঁকে কলকাতায় আনার চেষ্টা করেন। জমিরুদ্দিন

কলকাতাস্থ মিশনারীদের আহবানে কলকাতায় আসতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি কলকাতায় বেশিদিন থাকতে পারেননি। কারণ সেই সময়ে নদীয়া জেলায় মুসলমানদের সাথে খৃষ্টান মিশনারীদের গন্ডগোল বাধে। সেই মুহূর্তে নদীয়া জেলায় মুসলমান মিশনারী একান্ত প্রয়োজন ছিল। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীরা ভাল কাজ করতে পারছিল না। মিশনারীরা মনে করলেন নদীয়া অঞ্চলে মুসলমান মিশনারী পাঠালে ভাল ফল হবে। তাই কলকাতায় সি, এম, এস. কনফারেন্সের আদেশানুসারে তাঁকে নদীয়ার শিকারপুরে আসতে হয়।[১৯] কলকাতায় তিনি মাত্র দু'বছর ছিলেন। জমিরুদ্দিন এবার নিজ জেলায় আসলেন। শিকারপুরে এসে তিনি অনেক পরিশ্রম করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। শীতকালে তাঁবুতে এবং বর্ষাকালে নৌকাতে থেকে এ সব অঞ্চলে প্রচার করতেন। তিনি বিভিন্ন মুসলমান-প্রধান গ্রামে যেতেন এবং খৃষ্ট ধর্মের সপক্ষে এবং ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে জোরালো বক্তৃতা দিতেন।

নদীয়ার শিকারপুরে থাকাকালীন সময়ে পাদরী রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিন 'খৃষ্টান বান্ধব' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম 'আসল কোরান কোথায়' ছাপা হয় জুন ১৮৯২ সংখ্যায়। প্রবন্ধটি মুসলিম সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এতে ছয়টি প্রশ্ন উথাপন করে বলা হয় যে, হযরত মুহম্মদ (সা)-এর সময়ে কোরআন সংকলিত হয়নি। হযরত আবুবকর ও হযরত ওসমান সে কাজ সম্পূর্ণ করেন। এরূপ প্রশ্ন ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্নের 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে।[২০]

অবশেষে মুনশী মেহেরুল্লাহ এগিয়ে আসলেন। তিনি এই আক্রমণের প্রতি-উত্তর প্রদান করেন। তিনি "ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সুধাকর) লেখে রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিনের যুক্তি খণ্ডন করেন।

এই তর্কযুদ্ধের পর থেকে জমিরুদ্দিনের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল।

পাদরী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দিন তখন নদীয়ার শিকারপুরে রয়েছেন। সেই সময়ের ঘটনা। তখন ১৮৯২ সাল। কুষ্টিয়ায় একদিন মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের এক প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্ক সভায় মুন্সীজী খৃষ্টান সমাজের একজন প্রখ্যাত বক্তা হিসেবে জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় হাজার হাজার মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী মানুষ উপস্থিত ছিল। পাদরী জমিরুদ্দিন জোরালো বক্তৃতা দিয়ে সেদিন হাজার হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই সভা শেষে ফেরার পথে মধুগাড়ী নামক এক স্থানে তিনি রাত কাটাতে বাধ্য হন। মধুগাড়ীতে এক তাঁবুর নিচে গভীর রাতে কোরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ পাঠ করছিলেন এবং তা গভীর মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করছিলেন। এক সময়ে সূরা আস্–সাফ্ফ–এর ৫ আয়াতে (৬১শ সূরা) এসে হঠাৎ পড়া বন্ধ করলেন। এখানে লেখা আছে, "ঈসা বলিলেন ...... আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ, যাঁহার নাম আহমদ, আগমন করিবেন।" এই বাক্যটি পড়ার পর পরই তাঁর মনে হাজারো প্রশ্ন এসে ভিড় করলো এবং তিনি ভাবলেন এই বাক্যটি নিশ্চয়ই বাইবেলে ছিল, কিন্তু দুষ্ট খৃষ্টানরা বাইবেল থেকে তা বাদ দিয়েছে। তারপর থেকে তাঁর মনে একটি প্রশ্ন বারবার নাড়া দিতে লাগলো, তবে কি বাইবেল বিকৃত হয়েছে? দুষ্ট খৃষ্টানরা কি বাইবেল ইচ্ছামত সংশোধন করেছে?

জমিরুদ্দিন তারপর গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং বার বার বাইবেল পড়তে থাকেন। তখন তিনি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বাইবেল অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিতে পড়তে থাকেন। বাইবেল গভীরভাবে পড়তে পড়তে তিনি দেখলেন তাঁর অনুমান ঠিক। বাইবেল অবশ্যই বিকৃত হয়েছে এবং খৃষ্টানরা তাদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। তিনি খুঁজে খুঁজে বাইবেলের বেশ কিছু ভুল বের

করলেন। পাদরী জমিরুদ্দিনের মনে এই 'ভুল' রেখাপাত করলো। তিনি ধর্ম নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন, "খৃষ্টধর্মের ভিত্তি যখন বাইবেল আর সেই বাইবেল যখন বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে—এটা যখন আমি বিশেষভাবে অবগত হলাম, তখন খৃষ্ট ধর্মে আমার অনাস্থা অভক্তি ও সন্দেহ জন্মিল।"২১ মুন্সীজী তাঁর "আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখেছেন, "যে ধর্মের জন্য আমার স্নেহের পিতা-মাতা, প্রাণসম ভ্রাতা-ভগিনী, প্রাণের প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, সত্য ও সনাতন মুসলমান ধর্ম্ম, এমন কি জগৎ পরিত্যাগ করিলাম, সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হইল—ইহাতে আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি করি ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারি না। খৃষ্ট ধর্ম যে মিথ্যা হইবে পূর্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই। অনেক চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া হৃদয় খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বাইবেল পাঠ করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমি যতই বাইবেল পাঠ করি ততই যেন বাইবেলের ভ্রষ্টতা দেখতে পাই।"২২

জমিরুদ্দিন যখন ছাত্রাবস্থায় এলাহাবাদে থাকতেন, সেই সময় বাঙ্গালী ব্রহ্মদের সাথে তিনি মিশতেন। সময় সময় তিনি তাঁদের মন্দিরে যেতেন, তাঁদের বক্তৃতা শুনতেন এবং তাঁদের শাস্ত্র ও ধর্মমত তাঁর কাছে ভাল লাগতো। এ সময় তিনি একথাও ভাবলেন যে, বিকৃত খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অনেক ভাল। এ সময় তিনি ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে রচিত রাজা রাম মোহন রায় ও বাবু কেশব চন্দ্র সেনের কয়েকটি বইও পড়ে ফেলেছিলেন।

এমনি এক দিনের কথা। সেদিন তিনি বিকেলে কলেজ স্ট্রীট দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। পথে বিজ্ঞাপন দেখলেন যে, ঐদিন বিকেলে বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্মপণ্ডিত 'মুহাম্মদ ও তাঁহার ধর্ম' সম্বন্ধে আলবার্ট হলে বক্তৃতা করবেন। তিনি এই বিজ্ঞাপন দেখে খুব খুশি হন এবং তাড়াতাড়ি আলবার্ট হলে যান ও বক্তৃতা শুনতে থাকেন। বক্তার কথাগুলি

তাঁর কাছে বেশ মূল্যবান বলে মনে হলো। বক্তা বললেন যে, খৃষ্টানরা অন্যান্য ধর্মের মহত্ত্ব দেখতে পান না। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর প্রতি বিদ্বেষভাব দেখায়। অনেক খৃষ্টান পন্ডিত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্পূর্ণ ভণ্ড, কপট, বিলাসী, নৃশংস ও ধর্মহীন বলে থাকেন। কিন্তু যার ভেতরে ধর্ম নেই তিনি কি কখনো ধর্ম স্থাপন করতে পারেন? কপট, নৃশংস, অসভ্য ও ভন্ড লোক কখনও ধর্ম স্থাপন করতে পারে না। সত্য সনাতন বিধাতা যদি মুহাম্মদ (সা)–কে সাহায্য না করতেন, তাহলে মুহাম্মদ (সা)–এর সাধ্য কি যে তিনি ধর্ম রচনা করেন। সহস্র সহস্র লোক মুহাম্মদ (সা)–এর অনুবর্তী হয়েছিলেন। এখনো কোটি কোটি লোক তাঁর উপদেশের বশবর্তী হয়ে প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ছেন। এখনো তাঁর উপদেশে অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র নাম কীর্তন করছেন। খৃষ্টানদের এই মহামানবকে ভন্ড বলা বাতুলতার পরিচয় দেয়া ভিন্ন আর কি হতে পারে? ঐদিনের ব্রাহ্ম পন্ডিতের এসব কথা শুনে জমিরুদ্দিন ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ–আলোচনা ও চিন্তা–ভাবনা করতে থাকলেন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

এ ধরনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে সত্য ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে মেহের উল্লাহ সাহেবের সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হবার পর থেকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অধিক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি মুনশী মেহের উল্লাহ সাহেব কৃত 'রদ্দে খ্রীষ্টায়ান ও দখিলোল ইসলাম,' মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহ্‌মদ ও শেখ আবদুর রহিম সাহেব কৃত 'ইসলাম তত্ত্ব' (১ম ও ২য় খন্ড) প্রভৃতি গ্রন্থ পড়তে থাকেন। এ সব বই পড়ে তিনি তাঁর মনের সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন।

এবার মনে মনে ঠিক করলেন যে, তিনি আর খৃষ্ট সমাজে থাকবেন না। ব্রাহ্ম ধর্মও গ্রহণ করবেন না। নিশ্চয় তিনি মুসলমান হবেন। তিনি

তখন প্রথমে কয়েকজন খৃষ্টান বন্ধুর কাছে তাঁর ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস ও খৃষ্ট ধর্মে অবিশ্বাসের কথা বললেন। তাঁর বন্ধুরাও তাঁর কাছে তাদের বিশ্বাসের অনেক কথা বললেন, তাতে জমিরুদ্দিন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে, তারা ঠিক খৃষ্ট ধর্ম মানে না। কেবল টাকার জন্যে খৃষ্ট সমাজে রয়েছেন। পরে মুন্সীজী একজন বিলাতী পাদরীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কি যীশু খৃষ্টকে পূর্ণ ঈশ্বর বলে মানেন? তিনি উত্তর করলেন, "খৃষ্ট ঈশ্বর একথা তিনি বলেন নি, আমিও বলি না, আপনিও বলবেন না।" পরে জমিরুদ্দিন আরো কয়েকজন প্রচারকের কাছে খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে, তাদের মধ্যে কেউ নাস্তিক, কেউ অবিশ্বাসী বা ব্রহ্ম। মুন্সীজী তাঁর জীবন বৃত্তান্তে তাই লিখেছেন, "যখন বুঝিলাম যে, খৃষ্টানদের এই অবস্থা, তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে ও মুসলমান ধর্মের স্বপক্ষে প্রচার আরম্ভ করিলাম।"২৩ তাঁর এই বক্তব্য যখন মিশনারীদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেল, তখন অনেক বড় বড় মিশনারী এ সংবাদে দুঃখিত হলেন ও জমিরুদ্দিনকে বোঝাতে লাগলেন। অর্থের প্রলোভন দিয়ে চাকরির বিশেষ উন্নতি করে দিতে চাইলেন।

কিন্তু জমিরুদ্দিনের যা কথা তাই কাজ। তিনি খৃষ্টানদের বিভিন্ন অনুরোধ, আবেদন ও নিবেদনের প্রতি উত্তরে বললেন, "দোদেল বান্দা কলমাচোর, না পায় বেহেশ্‌ত না পায় গোর।" তিনি মিশনারীদের ত্যাগ করে সোজা নিজের বাড়িতে চলে আসলেন। দীর্ঘ ৮ বছর পর তিনি গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামে এলেন। পিতা শেখ আমির উদ্দিনসহ আম্মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাই জমিরুদ্দিনের আগমনে খুবই খুশি হলেন। দীর্ঘদিন পর মা-বাবার চোখেমুখে হাসি ফুটলো। আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এসে জমিরুদ্দিনকে ঘিরে বসে গল্প করলেন। জমিরুদ্দিন আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসলেন। মৌলভী রেয়াজ-উল-হক জমিরুদ্দিনকে খৃষ্ট সমাজ থেকে ইসলাম ধর্মে পুনরায় দীক্ষা দেন।

ইসলাম ধর্মের সুশীতল ক্রোড়ে ফিরে আসার পর তার মুখ্য কর্মোদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার এবং ইসলাম-খৃস্ট ধর্ম, কুরআন-বাইবেল ও মুহাম্মদ-যীশু বিতর্কে খৃস্টান মিশনারী পাদরীদের বিরোধিতা । সেই উদ্দেশ্যে তিনি ও মুনশী মেহেরউল্লাহ বাঙলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁরা ইসলামী আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখেন।

ধর্মীয় প্রচারকার্য ছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা-আন্দোলনের সাথেও জমিরুদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বক্তৃতা প্রদানের দ্বারা এবং প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্লেদ-কুসংস্কার দূর করার প্রচেষ্টা চালান। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরোধিতা করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন, তা উনবিংশ শতাব্দিতে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু বিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমন কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে জমিরুদ্দিন বিস্ময়কর, বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত "মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার" শীর্ষক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করতে পারি। এ প্রবন্ধে নিপীড়িত নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে তিনি বিদ্যাসাগরের মতই বেদনার্ত এবং উচ্চকন্ঠ। প্রবন্ধটিতে জমিরুদ্দিন নারীর ব্যক্তি-সত্তার প্রতি এবং নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন ঘোষণা করেছেন। বর্তমান শতকের প্রথম পাদে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে মুন্সীজী ছিলেন বলিষ্ঠ কর্মী। বাংলা-আসামের জেলায়-জেলায়, গ্রামে-গ্রামে সভানুষ্ঠান করে তিনি মুসলমান জনসাধারণকে ইংরেজি শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। তাদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা ১৩১০ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি অধিবেশনে যে

সংসদ গঠিত হয় তিনি তার সদস্য নির্বাচিত হন। এর তিন বছর পর ১৩১৩ সালে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দ) ঢাকায় নিখিল ভারতে মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন বসে। এই ঐতিহাসিক সম্মেলন সংগঠনের কাজে জমিরুদ্দিন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এই সময়ে নবগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সাথে জমিরুদ্দিনের সংযোগ স্থাপিত হয়। পরবর্তী বছর ১৩১৪ সালে তিনি করাচীতে অনুষ্ঠিত 'মহামেডান' এডুকেশন কনফারেন্স ও অল ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ-এর অধিবেশনে যোগদান করেন।[২৪] এভাবে লক্ষ্য করা যাবে যে, রাজনীতির ক্ষেত্রে জমিরুদ্দিনের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল মুসলিম লীগের প্রতি।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এদেশের মুসলিম জনমনে তুরস্কের প্রতি সমর্থন এবং সে কারণে কিয়ৎ পরিমাণে ইংরেজ-বিরোধী ভাব বিস্তার লাভ করছিল। বস্তুত বল্‌কান যুদ্ধের কাল থেকেই এ দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে তুরস্ক সমর্থনে একটি অনুকূল জনমত গড়ে উঠে।

শেখ জমিরুদ্দিনের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। স্বগ্রাম গাড়াডোবের নিকটবর্তী খোকসা গ্রামে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শামসুন্নেসা। বিবাহের সময় তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো নয় বছর। ১৩০৮ সনের ৮ কার্তিক অল্প বয়সে শামসুন্নেসা পরলোকগমন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৩০৯ সনের আষাঢ় মাসে (১৯০২ সাল) কুষ্টিয়ার অন্তর্গত দহকুলা গ্রামের হাজী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহর 'মধ্যমা' কন্যা সালেহা খাতুনের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের কর্মজীবন অত্যন্ত ঘটনাবহুল। স্কুল জীবনে খৃষ্টানদের প্রলোভনে পড়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ, তারপর দীর্ঘকাল খৃষ্ট সমাজে অবস্থান ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া, পরবর্তীতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসা এবং বাকি জীবন ইসলাম

ধর্মের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত করা প্রভৃতিসহ অসংখ্য ছোট-বড় ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল। মুসলিম বাংলার এই নিবেদিত প্রাণকর্মী ১৩৪৪-এর ২ আষাঢ় তাঁর জন্মস্থান মেহেরপুর জেলার গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামে ইন্তিকাল করেন।[২৫]

পাদটীকা

১. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত ঃ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন। সম্পাদনা ঃ মুহম্মদ আবু তালিব ও মোহাম্মদ গোলাম মখাদয়াম (নতুন সংস্করণ ১৯৬৭) রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১।
২. ঐ পৃষ্ঠা-২।
৩. ঐ পৃষ্ঠা-১।
৪. রদ্দেনাছারা ঃ মুন্সী মনিরুদ্দিন আহমদ, ৩য় সংস্করণ, ১৩৩৩ সন, পৃষ্ঠা- ১১।
৫. ঐ পৃষ্ঠা-১২
৬. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-২।
৭. প্রবাহ, ২য় সংখ্যা, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৭৯, মেহেরপুর, পৃষ্ঠা-১।
৮. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-২।
৯. ঐ পৃষ্ঠা-৩।
১০. ঐ পৃষ্ঠা-৩।
১১. ঐ পৃষ্ঠা-৩।
১২. ঐ পৃষ্ঠা-৪।
১৩. ঐ পৃষ্ঠা-৫।
১৪. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ঃ আনিসুজ্জামান (ভারতে প্রথম প্রকাশ) নভেম্বর ১৯৭১, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩০৫।
১৫. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-৭।
১৬. মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-৩০৫।
১৭. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-৮।
১৮. মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দিন ঃ আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা শীত ঃ ১৩৬৭, পৃষ্ঠা-১০৬।
১৯. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত পৃষ্ঠা-৮।
২০. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ ঃ শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, কলিকাতা, ১৯৩৪ সাল পৃষ্ঠা- ৩২।

২১. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, পৃষ্ঠা-১০।
২২. ঐ পৃষ্ঠা-১০।
২৩. ঐ পৃষ্ঠা-১০।
২৪. ইসলাম প্রচারক পত্রিকা, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা।
২৫. মুন্সী জমিরুদ্দিন ঃ মুস্তফা নূর-উল ইসলাম ঃ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬।

ইসলামী আন্দোলন ও মেহেরউল্লাহ-জমিরুদ্দিন

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহর অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুনশী মেহের উল্লাহর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একান্ত অকৃত্রিম বন্ধুর মতো মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তাঁর সাথে ছিলেন। এই দুই পুরুষের বক্তৃতার মর্মবাণী সেদিন বাংলা–আসামের সর্বস্তরের মুসলমানের হৃদয় স্পর্শ করেছিল এবং তাঁরা তাদের হৃদয় রাজ্যের প্রিয় মানুষ হতে পেরেছিলেন। তাঁরা খৃষ্টান মিশনারীদের চক্রান্তকে নির্মূল ও বিনাশ করার কাজেও সফলতা অর্জন করেছিলেন।

জমিরুদ্দিন স্কুল জীবনে খৃষ্টানদের প্রলোভনে পড়ে খৃষ্ট সমাজে ৮ বছর অবস্থান করে আবার তিনি ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়ায় ফিরে আসেন। জমিরুদ্দিন খৃষ্টান থাকাকালীন সময়ে মুনশী মেহের উল্লাহ সাহেবের নাম প্রথম শোনেন। তিনি জানতেন মুনশী মেহের উল্লাহ মুসলমানদের মধ্যে একজন নামকরা বক্তা ও কুরআন–হাদীস জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। জমিরুদ্দিন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মিশনারী হিসেবে নদীয়ার শিকারপুরে নিযুক্ত ছিলেন।[১] তখন তাঁর নাম পাদরী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দিন। এই সময়ে তিনি 'খৃষ্টান বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কোরান কোথায়?' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি ছাপা হয় ১৮৯২ সালের জুন মাসে।

'আসল কোরান কোথায়?' প্রবন্ধে রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিন উল্লেখ করেন যে, তিনি খৃষ্টান সমাজে থাকাকালীন অবস্থায় অনেক মুসলমান তাঁকে উদ্দেশ করে বলতেন, খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু কুরআন পরিবর্তিত হয়নি। খোদা তা'আলা মুহাম্মদ (সা)–এর উপর যা নাজিল করেছিলেন আজ পর্যন্ত অবিকল তাই রয়েছে। মুসলমানরা একথা

বিভিন্ন গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করেছেন। জন জমিরুদ্দিন এই প্রবন্ধে মুসলমানের হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদাহরণ তুলে দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'আসল কোরআন' বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে ছয়টি প্রশ্ন তুলে ধরা হলো।

(ক) কোরান মোহাম্মদ (সা)—এর সময় একত্রে সংগৃহীত হয়নি। (দেখ তিরমিজী সুন্নী মুসলমানদের হাদীস)। (খ) মোহাম্মদ (সা.)—এর মৃত্যুর পর খলীফা হযরত আবু বকর (রা) জায়েদকে দিয়ে কোরান শরীফের সূরাগুলো একত্র এবং শৃংখলাবদ্ধ করেছিলেন। (দেখ বোখারী গ্রন্থ)। (গ) ওসমান (রা.) দু'বার কোরান দগ্ধ করেন। (দেখ মেশকাতউল খারী) (ঘ) শিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে যে, কোরানে আলী (রা.)—র এবং তাঁর বংশের মাহাত্ম্যের সব বিষয়ে অনেক কথা লেখা ছিল। কিন্তু 'কাফের' ওসমান (রা.) তা কোরান শরীফ থেকে পৃথক করে দগ্ধ করে ফেলেছিলেন। (দেখ নহল আল বালাগত এবং শিয়াদের হাদিস) (ঙ) ইমাম জাফর বলেছেন যে, সূরা আহজাবে কোরেশের স্ত্রী ও পুরুষের ভ্রষ্টতার বিষয় বর্ণিত ছিল। ঐ সূরাটি সূরা বাকারা থেকে বড়। (দেখ আইনুল হক গ্রন্থের দু'শ আট পৃষ্ঠা) (চ) হযরত মোহাম্মদ (সা.) ছিলেন নিরক্ষর। যখন কোরানের আয়াত তাঁর ওপর নাজিল হতো তখন হাফেজেরা তা মুখস্থ করে রাখতো। আবার কখনো চামড়ায় অথবা খোরমা পত্রে লিখে বাক্সে রাখা হতো এবং যা লিখিত হতো না, তা মুখস্থ করে রাখা হতো। এভাবে ২৩ বছরের মধ্যে কোরান নাজিল শেষ হয়। জন জমিরুদ্দিন এখানে উল্লেখ করেন, যেহেতু মোহাম্মদ (সা) নিরক্ষর তাই হাফেজরা ভুল করলে তাঁর পক্ষে ধরা সাধ্য ছিল না।[২]

পাদরী রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দিন 'আসল কোরান কোথায়?' প্রবন্ধে উপরোক্ত ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করে জোর গলায় প্রমাণ করতে চাইলেন যে, প্রচলিত কোরান শরীফ মূল কোরান নয়। তৎকালীন মুসলমান

সমাজে জন জমিরুদ্দিনের প্রবন্ধটি কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্য রত্নের রচনায় তার বর্ণনা রয়েছে।

"খৃষ্টান পাদ্রী জন জমিরুদ্দিন জগতে আর আসল কোরান নাই বলিয়া যখন মহাদম্ভে ইসলামের বিরুদ্ধে আস্ফালন ও আক্রমণ আরম্ভ করিলেন তখন বঙ্গীয় মুসলমান ভীতি বিহবল ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় রহিল। তাঁহার এই ভয়াবহ প্রবন্ধের যে কি উত্তর হইতে পারে তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না। যেমন নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণ সহসা ভীষণ শার্দূল সন্দর্শনে সভয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিজ গৃহ কোণে ছুটিয়া যায় কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস পায় না। পাদ্রী সাহেবের ভীষণ প্রবন্ধে বাঙালী মুসলমানেরও সেই অবস্থা হইল। কেহই ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।"৩

অবশেষে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এই প্রবন্ধের উত্তর লিখলেন। তিনি 'ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সুধাকর) লেখে রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দিনের যুক্তি খন্ডন করেন। জমিরুদ্দিন এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন 'সুধাকর'-এ একটি ছোট প্রবন্ধ লেখে (২৩ বৈশাখ, ১৩০০)। এর জবাবে সুধাকরে মেহেরউল্লাহ লেখেন 'আসল কোরআন সর্ব্বত্রই' নামে একটি প্রবন্ধ (১৭ আষাঢ়, ১৩০০)। এরপর জমিরুদ্দিন আর তর্কে প্রবৃত্ত হননি।

মুনশী মেহেরউল্লাহ'র সাথে তাঁর এই তর্কযুদ্ধ কেবল তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়, বাঙালি মুসলমানদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনাও বটে। এই ঘটনার পর থেকে জমিরুদ্দিন মুনশী মেহেরউল্লাহকে অন্য দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরপরই তিনি ইসলাম ধর্মের কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় গভীরভাবে পড়াশুনা করতে থাকেন। কুরআন-হাদীস অনুসন্ধান করতে করতে তিনি অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন

এবং খৃস্ট ধর্মের বাইবেলের অনেক ভুল-ভ্রান্তি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি লক্ষ্য করতে থাকেন খৃস্টানরা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাইবেলে অনেক বিষয় যোগ ও বিয়োগ করেছেন।

অবশেষে তিনি আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসলেন এবং ১৩০৪ সনের প্রথম দিকে বিখ্যাত 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার সম্পাদক ও প্রখ্যাত লেখক রিয়াজ উদ্দীন আহমদের সাথে আলাপ করেন। তাঁর কাছে তিনি ইসলাম প্রচারে নিজকে নিয়োজিত রাখার কথা বলেন।[৪] রিয়াজ উদ্দীন আহমদ তাঁর কথা শুনে খুব খুশি হন। তিনি তখন তাঁকে মুন্সী মেহেরউল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন এবং তাঁর সাথে যোগ দিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হওয়ার পরামর্শ দেন। মুন্সী জমিরুদ্দিন 'ইসলাম প্রচারক'-এর সম্পাদকের কথামত মুনশী মেহেরউল্লাহ সাহেবকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি ইসলাম প্রচারের কাজে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহের কথা উল্লেখ করেন এবং সত্বর তাঁর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই চিঠি লেখার পর ঐ বছরের ১১ ফাল্গুন এই দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।[৫] এই দুই বন্ধুর প্রথম সাক্ষাৎ মুসলিম বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৩০৪ সালের ১১ ফাল্গুন সাক্ষাতের পর থেকে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুনশী মেহেরউল্লাহ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের মতো উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী ও সুবক্তা ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকর্মী হিসেবে পেয়ে খুশি হলেন। মেহেরউল্লাহ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তাঁর মতো উপস্থিত বুদ্ধি এবং কুরআন-হাদীস জানা অভিজ্ঞ পন্ডিত মুসলিম বাংলায় ছিল না বললেই চলে। জমিরুদ্দিনও তাঁর মতো একজন মহান ব্যক্তিকে বন্ধু হিসেবে পেয়ে কম খুশি হলেন না।

মুন্সীজীর প্রথম গ্রন্থ 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' মুনশী মেহের উল্লাহর পরামর্শে প্রকাশ পায়। শুধু এই গ্রন্থটি নয়

জমিরুদ্দিনের অনেক গ্রন্থ প্রকাশের পিছনে মেহেরউল্লাহ সাহেবের উপদেশ, পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করেছিল। 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে ১৩০৪ সনের ১৮ বৈশাখ মেহেরউল্লাহ সাহেব জমিরুদ্দিনকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি বলেন, "আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই--আপনি প্রথমতঃ কিছুদিন ধর্ম সম্পর্কে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সুধাকর'-এ প্রকাশ করুন। যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপানোর ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয় তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহণ করিব।" মুনশী মেহেরউল্লাহ জমিরুদ্দিনকে একটি চিঠি দিয়েই চুপ করে বসে থাকলেন না। তিনি 'সুধাকর' পত্রিকায় একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করলেন। মুনশী মেহেরউল্লাহর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার নিদর্শন এই আবেদনপত্রে আমরা দেখতে পাই। তিনি এখানে উল্লেখ করেন, শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সাহেব একজন উপযুক্ত প্রচারক ও তেজস্বী বক্তা। তদৃশ একজন শিক্ষিত পুরুষের স্বেচ্ছায় খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে আত্মোৎসর্গ করা, বাস্তবিক আমাদের গৌরবের বিষয়।[৬]

এই দুই বন্ধু সেদিন মিশনারীদের প্রচারকে ব্যর্থ করে মুসলিম জনমনে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ব্রতে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে বাংলা-আসামের গ্রামে-গ্রামে, জেলায়-জেলায় ঘুরতে লাগলেন। তাঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ।

১৩০৫ সালে এই দুই বন্ধু প্রচারোদ্দেশ্যে নোয়াখালী গেলেন।[৭] সেখানে দুই বন্ধু বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁদের সভানুষ্ঠান সম্পর্কে জনৈক কবি দোভাষী পুঁথির ভাষায় তা রচনা করে প্রকাশ করেন। 'আখলাকে আহমদিয়া' নামক উক্ত পুস্তিকায় কবি লিখেছেন ঃ

মুন্‌শী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম,
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম।
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেক্‌কার
মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দিন গুণের ভান্ডার,
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে বাঙ্গালার
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে
এসেছিল নোয়াখালি শহর বিচেতে।
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলি ইস্কুলে,
শুনিল তামাম লোক আনন্দিত দেলে,
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউন হলেতে,
সেদিনের বাত এসে শুন সকলেতে,—
জজ্ কালেক্টর আর যতেক আলিম
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃষ্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখানে।
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ হুঁশিয়ার হইয়া,
ওয়াজ করিল শুরু এলাহী ভাবিয়া।
এয়ছাই ওয়াজ কৈল কিমার বয়ান,
হিন্দু মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।[৮]

এই দুই কর্মবীর গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় সভানুষ্ঠান করেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্ম-জীবনের ভাঙ্গনকে রোধ করতে, যে ধর্ম-জীবনের ভাঙ্গন এসেছিল খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের প্লাবনে।

তখনকার মুসলিম বাংলায় বক্তা হিসেবে এই দুই ব্যক্তি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মুনশী মেহেরউল্লাহ'র মৃত্যুকাল ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ[৯] পর্যন্ত তারা দু'জন ইসলাম প্রচারোদ্দেশ্যে এক সাথে মিলিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করতেন এবং সভানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের সভানুষ্ঠান ও বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হতো। এ

সব বিবরণ থেকে মেহেরউল্লাহ ও জমিরুদ্দিনের অসামান্য বক্তৃতা দান ক্ষমতা ও সে সব বক্তৃতার কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্যাদি জানা যায়। 'সুধাকর' পত্রিকায় কবি মোজাম্মেল হক রানাঘাটে অনুষ্ঠিত এক তর্ক সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেন ঃ

"প্রথমে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন সাহেব হামদ নায়াত অন্তে বক্তৃতা করেন। ইহার তেজপূর্ণ, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা অতীব প্রশংসনীয় শ্রবণে বিবিধভাবে হৃদয় উচ্ছসিত হইয়া উঠি। ইনি অনর্গল তিন ঘন্টা বক্তৃতা করার পর মুসলমান সমাজের প্রবীণ বক্তা মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব গাত্রোত্থান করলেন। ইহার যুক্তিপূর্ণ মধুর বক্তৃতায় শ্রোতাবর্গ অতীব বিমোহিত হইয়াছিল। তাঁহারা কখনো বিস্মিত, ভীত, চমকিত কখনো বা উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিতে ছিলেন।"[১০]

মুনশী মেহেরউল্লাহ ১৯০৭ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে মুন্সীজী শুধু একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারালেন না, বাঙ্গালী মুসলমানরা হারালো একজন প্রবীণ ইসলামী চিন্তাবিদ, সুবক্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে। তাঁর মৃত্যুতে জমিরুদ্দিন নিজকে অসহায় বোধ করলেন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর জীবনী লিখতে শুরু করলেন। প্রথমে তিনি 'ইসলাম প্রচারক'–এর ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী নামে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং তাঁর জীবনী বিস্তারিত বর্ণনা করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন।

এই দুই বন্ধু ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম বক্তৃতা করে হাজার হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ ও তীক্ষ্ণ যুক্তির শরাঘাতে অতি সহজেই তাঁরা প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারতেন। খৃস্টান মিশনারীরা যখন কুরআন ও মুহাম্মদ (সা)–এর বিরোধিতা করে বহু স্থানেই মুসলমানদের মধ্যে সফলতার সাথে ভাঙ্গন ধরানো, তাঁদের বক্তৃতার প্রতিবাদ করবার মতো ব্যক্তি যখন মুসলমান সমাজে বিরল—সেই

দুর্দিনে মেহেরউল্লাহ ও জমিরুদ্দিন শুধুমাত্র যে মিশনারী প্রচারণাকে প্রতিহতই করেছেন তা নয়। বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনার উদ্বোধনে ও আত্মশক্তিতে আস্থা অর্জনে তাঁদের অবদান ঐতিহাসিক গুরুত্বে চিহ্নিত। এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু সেদিন লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলিম বাংলায় ধর্মীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে নব জাগরণের সূচনা করেছিলেন তা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চিরকাল বাঙালি মুসলমান তাঁদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

পাদটীকা

১. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত—মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন (নতুন সংস্করণ) রাজশাহী ১৯৬৭ খৃঃ, পৃঃ ৫।
২. মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ ঃ দেশ-কাল-সমাজ, মুহম্মদ আবূ তালিব, ১৯৮৫, ঢাকা, উদ্ধৃতি -পরিশিষ্ট, পৃঃ ১৭০।
৩. কর্মবীর মেহেরুল্লাহ, শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, উদ্ধৃতি কলিকাতা ১৯৩৪ সাল, পৃষ্ঠা- ৩২।
৪. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত-মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন (নতুন সংস্করণ ১৯৬৭) রাজশাহী, পৃষ্ঠা-১১।
৫. মুনশী মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন-আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, শীত, ১৩৬৭, পৃ- ৮৮।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ ঃ শেখ হাবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, কলিকাতা ১৯৩৪, পৃষ্ঠা-৩২-৩৩।
৮. শেখ জমিরুদ্দিন-মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৬ উদ্ধৃতি।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ঃ দেশ-কাল-সমাজ, মুহম্মদ আবূ তালিব ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ঢাকা।

বাংলা সাহিত্যে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন মুসলমানদের জন্য স্বাতন্ত্র্যধর্মী এক অন্যতম শক্তিশালী লেখক ছিলেন। এই ধারার লেখকদেরকে অনেকে 'সুধাকর দল' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তাঁরা ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। ১২৯৬ সনের (১৮৮৯) আশ্বিন মাস থেকে শেখ আবদুর রহীম ও মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদের প্রচেষ্টায় সুধাকর (সাপ্তাহিক) পত্রিকাটি প্রকাশ হতে থাকে।

এই সময়ে পন্ডিত জামালুদ্দিন আফগানীর ফারসী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ 'এসলাম তত্ত্ব' প্রথম খণ্ড আকারে প্রকাশ পায়। এর পরই মওলানা আবদুল হক হাক্কানীর 'তফসিরে হাক্কানী' ভূমিকাংশের অনুবাদ 'এসলাম তত্ত্ব' দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের এসলাম তত্ত্বের প্রকাশকাল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ এবং পরের বছরই ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে 'এসলাস তত্ত্ব' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ইসলামের সেবায় জীবনী সংকলন, অনুবাদ, কবিতা, গযল, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, শিক্ষা, সামাজকল্যাণ ও বিধর্মীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রন্থাবলী রচনা করেন এবং বাংলা-আসামের জেলায় জেলায় বক্তৃতা দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চেতনা জাগিয়ে তোলেন। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বাংলা সাহিত্যে একজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের সাহিত্যে তার স্থান করে নিয়েছেন। তাছাড়া তাঁর অনুবাদ, জীবনী-সাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা ও গযল আমাদের সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে।

জমিরুদ্দিনের রচনা বিষয় ভিত্তিক আলোচনা

জমিরুদ্দিনের রচনাবলী তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে এবং তাঁর লেখা কিছু গ্রন্থ তৎকালীন সময়েই প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, জমিরুদ্দিনের ওই সব রচনা আজ দুষ্পাপ্য হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তৎকালীন মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করা আজ দুঃসাধ্য। বর্তমানে তার যে কয়টি লেখার সন্ধান পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করে তাঁর লেখা সম্পর্কে মন্তব্য বা পর্যালোচনা করা বেশ কষ্টকর। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে বিস্তারিত পরিচয় না পাওয়া গেলেও কিছু কিছু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, যার উপর ভিত্তি করে জমিরুদ্দিনের সাহিত্যকে আমরা নিম্নরূপভাবে শ্রেণী বিভক্ত করতে পারি।

(ক) জীবনীমূলক সাহিত্য (খ) অনুবাদ সাহিত্য (গ) কবিতা ও গযল (ঘ) ভ্রমণ সাহিত্য (ঙ) ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক রচনাবলী (চ) শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক রচনাবলী (ছ) বিধর্মীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রচিত গ্রন্থাবলী।

ক. জীবনী সাহিত্য

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে জীবনী সাহিত্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও উন্নত সাহিত্য গুণসম্পন্ন।[১] তাঁর জীবনী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হচ্ছে ঃ মেহের চরিত (মুনশী মেহের উল্লাহর জীবনী ১৩১৫), আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত (১৩০৪), Glory of Islam (1929), মাসুম মোস্তফা (সা), হযরত ইসহাক (রা) প্রভৃতি। এ ছাড়া বিভিন্ন মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু জীবনী সাহিত্য ছড়িয়ে রয়েছে, তন্মধ্যে 'পারস্য কবিদের বিবরণ' (ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০১), হযরত মওলানা

লুৎফুল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (ইসলাম প্রচারক ৬ষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী (ইসলাম প্রচারক ৮ম বর্ষ, ৫৫ সংখ্যা), 'হযরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' (ইসলাম প্রচারক, পৌষ ১৩০৩), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ (সিরাজগঞ্জ নিবাসী) মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ (বঙ্গনূর, আশ্বিন–১৩২৭), 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী' (ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর–ডিসেম্বর ১৯০১), 'হযরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' (কোহিনূর সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুন্সীজীর জীবনী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মেহের চরিত' (১৩১৫)। মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন জমিরুদ্দিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মুনশী মেহের-উল্লাহ'র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একান্ত অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তাঁর সাথে ছিলেন। মুনশী মেহেরউল্লাহ ১৩১৪ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন ১৯০৭) ইন্তিকাল করেন।[২] তাঁর মৃত্যুতে জমিরুদ্দিন নিজকে বড় অসহায় বোধ করলেন। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুর স্মরণে প্রথমে তিনি লিখলেন 'ইসলাম প্রচারক' (৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) পত্রিকায় "মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী" নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"যিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সভা–সমিতি–অধিবেশনের সূত্রপাত করিয়াছেন, যিনি খৃস্টীয় ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়া পাদ্রী ও খৃস্টীয়ানদিগের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়াছেন, যিনি ইসলাম ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মুসলিম কুলরত্ন, বাগ্মীকুলতিলক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ সোমবার দিবাগত রজনীতে যশোর জেলার অন্তর্গত 'ঘোপ' নামক গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।[৩]

ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধের পর জমিরুদ্দিন আরো বিস্তারিতভাবে লিখে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থে তিনি মেহেরউল্লাহ সাহেবের জীবনের বিভিন্ন দিক অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় তিনি মুন্সীজীর জন্ম, বাল্যজীবন, কর্মজীবন, মুসলিম বাংলায় তাঁর অবদান এবং সেই সাথে মুনশী মেহেরউল্লাহ ও তিনি কিভাবে সেই সময়ে খৃষ্টানদের প্রলোভনের আগুন থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই সংগ্রামের বিস্তারিত চিত্র এই গ্রন্থে রয়েছে। জমিরুদ্দিনের এই গন্থের ভাষা আড়ম্বরহীন, সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। মুন্সীজীর ব্যবহার্য বিষয় ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

"মুন্সী সাহেব সামান্য পোষাক পরিতেন ও সামান্য আহার করিতেন, আড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নূতন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলু-ভাত চাই, গোশত আমি খাই না। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন; কখনও কাহারও মনে কষ্ট দিতেন না। তিনি সর্বদা প্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও কোন বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, ছোট হইতে চেষ্টা করিতেন। নামাজে ইমাম হইবার জন্য আদৌ পা বাড়াইতেন না। তাঁহার বসতবাটি আড়ম্বরপূর্ণ নহে, সামান্য কয়েকখানি পর্ণকুটির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাসিতাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। তিনি শিক্ষক না হইয়া প্রায় ছাত্র হইতে চেষ্টা করিতেন। অহঙ্কার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রিপুর তিনি বশীভূত ছিলেন না, বৃদ্ধা জননীকে তিনি বড়ই ভক্তি করিতেন। কখনও তাঁহার অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করিতেন না।"[৪]

জমিরুদ্দিন এই গ্রন্থে মুনশী মেহেরউল্লাহ সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, মুনশী মেহের উল্লাহ আজীবন ইসলামের জন্য সংগ্রাম ও ইসলামের জয়গান করে গেছেন। কিন্তু পরিবারের অবস্থার দিকে ফিরেও তাকাননি। তাঁর পরিবারের সদস্যরা যে না-খেয়ে মরবে বা তাঁর মৃত্যুর পর ছেলে-মেয়েদের কি অবস্থা হবে তা একবারও তিনি ভাববার সময় পান নি। ইসলাম প্রচারের কাজে নিজে মশগুল থেকেছেন। জমিরুদ্দিন তাই এই কর্মবীর পুরুষের ছেলে-মেয়েদের দুঃখকষ্ট দেখে মহান করুণাময়ের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করে বলেছেন ঃ

"হে পরম করুণাময় খোদাতালা! তুমি ইচ্ছামত, যাহা তোমার ইচ্ছা করতে পার। দয়া করিয়া মুনশী সাহেবের আত্মাকে তোমার নিকটে স্থান দাও। তাঁহার সমস্ত অপরাধ মাফ কর, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও মাতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি । কৃপা করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তাহাদের অভাব মোচন কর।"[৫]

অশীতিপর বৃদ্ধা আম্মা, স্ত্রী, ছয় নাবালক পুত্র-কন্যা তখন অসহায়। তারা দিকভ্রান্ত, তারা অর্থহীন-সম্পদহীন হয়ে হতাশাগ্রস্ত, তাই তাদের সাহায্য করার জন্য যেন পাগলের মতো দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছেন ঃ "হে কৃতজ্ঞ দেশবাসিগণ! তোমরা মুনশী সাহেবের কথা স্মরণ করে তাঁর অসহায় পরিবার ও ছেলেমেয়েদের দিকে একবার তাকাও, তাদেরকে মদদ করো। মুনশী সাহেব সারা জীবন যা করেছেন, স্বজাতির জন্য করেছেন, দেশবাসীর জন্য করেছেন। নিজের জন্য তো কিছু রেখে যান নি। হে বঙ্গীয় মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! যিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, সেই মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ সাহেবের পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য কি তোমরা কোন বন্দোবস্ত করিবে না? হে মুনশী সাহেব কর্তৃক উপকৃত

মহোদয়গণ! তোমরা তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্র-কন্যার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর।"৬

মুনশী মেহেরউল্লাহর মৃত্যুকে তিনি অত্যন্ত আকস্মিক এবং ষড়যন্ত্রমূলক বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। সামান্য নিউমোনিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। জলপাইগুড়িতে এক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ যাত্রা বিরতি করে তিনি বাড়ি ফেরেন। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনে লেখক তাঁকে দেখতে যান ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ সনে, ছাতিয়ানতলায় তার নিজ বাড়িতে। অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় জমিরুদ্দিন বলেন ঃ "আমি নিকটে যাইয়া 'আচ্ছালামো আলায়কুম' বলিলাম, ইহার উত্তরে তিনি আলায়কুম আচ্ছালাম কহিলেন, পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। পরে আমি কলিকাতার মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি, কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন? রোগের ঔষধ আছে, মৃত্যুর ঔষধ নাই। মুনশী সাহেব ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টায় স্বীয় পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাইহি রাজিউন)।"৭

মুনশী মেহের উল্লাহ ছিলেন মুসলিম বাংলার অন্যমত ইসলামের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও চিন্তাবিদ এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন জমিরুদ্দিন। জমিরুদ্দিন রচিত এই গ্রন্থটি সম্পর্কে তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত উচ্চাশা পোষণ করেছেন। তাঁরা এই রচনাকে যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য রচনা বলে আখ্যায়িত করেন। বাসনা (মাঘ-চৈত্র ১৩১৫) পত্রিকায় বলা হয়, "যিনি গুণে সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান সমাজকে কিনিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতায় বাংলাদেশের মুসলমানেরা জাতীয় উন্নতির জন্য অভ্যুথান করিয়াছেন। সেই কর্মবীর ধর্মাত্মা মুনশী মেহেরুল্লা সাহেবের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কি আছে? শেখ সাহেব

পরলোকগত মহাত্মার জীবন কীর্ত্তন করিয়াছেন, যোগ্য হস্তে যোগ্য কাজ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

মুনশী মেহের উল্লাহর তথ্যনিষ্ঠ জীবনী গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিতি রয়েছে। তাছাড়া বাঙালি মুসলিম জনমনে মিশনারী প্রচার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজেও এই গ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে। এই গ্রন্থের রচনা মুন্সীজীর অন্যান্য গ্রন্থ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে উন্নত সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন 'মেহের চরিত' (১৩১৫) বাংলা জীবনী সাহিত্য ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

কালানুক্রমিক হিসেবে জমিরুদ্দিনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৩৩৪)। এই গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেন কিভাবে মুসলমান খৃস্টানদের প্রলোভনে পড়ে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। খৃস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, খৃস্ট ধর্ম প্রচার করে অসংখ্য মুসলমানকে খৃস্টান করার চেষ্টা এবং পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলাম ধর্মের সুশীতল ক্রোড়ে কিভাবে ফিরে আসেন, তার চিত্র তুলে ধরেন উক্ত পুস্তকে। জমিরুদ্দিনের এই গ্রন্থে তাঁর পিতৃ পরিচয়, তাঁর জন্মস্থান গাড়াডোব বাহাদুরপুরের তৎকালীন পরিবেশ, পিতার চরিত্রের বিভিন্ন দিক, মক্তবখানায় লেখাপড়া, বঙ্গ বিদ্যালয়ে আগমন, বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে কৃষ্ণনগরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি, নর্মাল স্কুলে থাকাকালীন সময়ে মিশনারীদের সাথে আলাপ, বিভ্রান্তিমূলক কিছু গ্রন্থ পাঠ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ, বাবা-মাকে ত্যাগ করে খৃস্টানদের আশ্রয় লাভ, উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতা ও এলাহাবাদ গমন, এইচ, জি, আর ডিগ্রী লাভ, পাদ্রী হিসেবে এলাহাবাদ, কলকাতা ও পরে নদীয়ায় খৃস্টধর্ম প্রচার করে অসংখ্য মুসলমানকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা, 'আসল কোরান কোথায়' নামে প্রবন্ধ লেখার মাধ্যমে মুনশী

মেহেরউল্লাহর সাথে তর্কযুদ্ধ এবং পরিশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে ফিরে আসার ঘটনাবলী অত্যন্ত সহজ ভাষায় এতে স্থান পেয়েছে।

জমিরুদ্দিনের বাল্য ও কর্মজীবনের বিভিন্ন দিকের তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ যেমন আমাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করবে, ঠিক তেমনি তৎকালীন সময়ে খৃস্টানদের প্রলোভনে কিভাবে অসহায় খাঁটি মুসলমান পরিবারের সন্তানরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতো তা জানা যাবে। গ্রন্থের ভূমিকায় তাই বলা হয়, "শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দিনের এই আত্মজীবনীতে সেকালের মুসলিম সমাজের পূর্ব-অসহায়তা ও পরবর্তী আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি চমৎকার বিবরণী উদ্ধৃত করা হয়েছে যার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য।"

'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ পায় ১৩০৪ (ইংরেজি ১৮৯৭) সনে। প্রকাশক ছিলেন মুনশী মুহম্মদ মেহেরউল্লাহ। গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথায় মেহেরউল্লাহ বলেন ঃ "শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন সাহেব একজন উপযুক্ত প্রচারক ও তেজস্বী বক্তা। তাদৃশ একজন শিক্ষিত পুরুষের স্বেচ্ছায় খৃষ্ট ধর্ম পরিত্যাগ ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে আত্মোৎসর্গ করা বাস্তবিক আমাদের গৌরবের বিষয়, কিন্তু তিনি যাবৎ মিশনারী পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাবৎ অর্থাভাবে অতি সামান্যাবস্থায় কালক্ষেপণ করিতেছেন। এ কথাও মুসলমান সমাজের পক্ষে তাদৃশ কলঙ্কজনক। শেখ সাহেব মুসলমান ধর্ম প্রচারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এখন উপযুক্ত সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা এসলাম বিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গর্ব খর্ব করিতে পারিবেন। অতএব হে স্বধর্ম হিতৈষী মুসলমান ভ্রাতাগণ, আপনারা সত্ত্বর উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়ে তাঁহার সুমধুর ওয়াজ শুনিয়া জীবন সার্থক ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে উৎসাহিত করুন।"

গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৩১৪ সালে (আষাঢ়)। কলকাতা রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত এই গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন দিনাজপুর শিমোর নিবাসী মোঃ উমরুদ্দীন চৌধুরী। গ্রন্থের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠে বলা হয় ঃ

"ইসাই দীনেতে আমি না পেয়ে নাজাত
কালেমা পড়িনু মুখে একিনের সাথ।"

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কথা জানা যায়। লেখকের ভক্তবৃন্দ বার বার তার কাছে এই বই পুনঃ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছে। কিন্তু অর্থাভাবে লেখক তা প্রকাশ করতে পারেন নি। অবশেষে উমরুদ্দীন চৌধুরী তা শুনে নিজে এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। জমিরুদ্দিন তাই বলেছেন, "স্বজাতি বৎসল ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ শ্রীযুক্ত মুন্সী মোহাম্মদ উমরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব 'ইসলাম গ্রহণ'-এর অবস্থা শুনিয়া প্রকাশ করিতে বদ্ধপরিকর হন। আজ তাঁহারই যত্ন ও অর্থ ব্যয়ে ইসলাম গ্রহণের তৃতীয় সংস্করণ জনসমাজে প্রকাশ করিতে পারিলাম। তাঁহার অনুগ্রহ না হইলে এত সত্ত্বর প্রকাশ হইত কিনা সন্দেহ।"

জমিরুদ্দিনের এই গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৬৭ সালের ২রা ডিসেম্বর রাজশাহী থেকে। গ্রন্থটি সম্পাদিত ; সম্পাদনা করেন মুহম্মদ আবু তালিব ও ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়ায্যাম। সম্পাদকদ্বয় বলেন, "বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানেও আজ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে এবং আধুনিকতার আড়ালে সর্বস্তরে ইসলাম বিরোধী আবহাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষাগারগুলোতে ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী সংস্কৃতির একান্ত অভাব। ফলে সংশয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদীর সংখ্যা দুঃখজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দেরও উল্লেখযোগ্য অংশ আজ ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন । অন্যদিকে দেশের সর্বত্র স্কুল, কলেজ,

হস্টেল, হাসপাতাল, সাহায্য শিবির ও শান্তির দ্বীপের ছদ্ম আবরণে খৃষ্টান মিশনারীরা আবার সুকৌশলে খৃষ্ট ধর্মের ভ্রান্ত শিক্ষা প্রচারের ব্যাপক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। যে ধরনের প্রচেষ্টা একদিন জমিরুদ্দিনকে খৃষ্টান করেছিল সে প্রচেষ্টা আজ আবার জোরদার হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া রাশিয়া ও চীনের সহযোগিতায় দেশের বর্ণচোরা কম্যুনিস্টদের ষড়যন্ত্রের ফলে আজ সারা দেশে আল্লাহ-বিরোধী কম্যুনিস্ট প্রচার-পত্র ও পুস্তিকার ছড়াছড়ি। এগুলো আজ জাতির যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করতে সাহায্য করছে। খৃষ্টান পাদরী ও বর্ণচোরা কম্যুনিস্টদের মতবাদের বাতুলতা আমাদের শিক্ষিত সমাজের বিশেষ করে যুব সমাজের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন বর্তমান সময়ে সমধিক। এমতাবস্থায় পাদরী জন জমিরুদ্দিনের ইসলাম গ্রহণের ইতিবৃত্ত নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়কে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং পবিত্র দীন ইসলামের উপর ঈমান দৃঢ় রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। তাই আমরা রাজশাহী 'ইসলামী মজলিস'-এর পক্ষে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থখানী সুধী সমাজের হাতে তুলে ধরার কোশেশ করলাম।"

'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃতান্ত' গ্রন্থে লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর জীবনের বিভিন্ন মোড় ও দিক তুলে ধরেছেন এবং সেই সাথে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের নিজ ধর্ম আঁকড়ে ধরে রাখার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এই গ্রন্থে আমাদের সামনে বিভ্রান্তিকর খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মের বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন।

'মেহের চরিত' (১৩১৪) গ্রন্থের মতো জমিরুদ্দিনের এই গ্রন্থের ভাষাও বেশ সহজ-সরল। এই গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, জমিরুদ্দিন ১২৭৭ সালের ১৫ মাঘ সোমবার তৎকালীন নদীয়া (বর্তমান মেহেরপুর) জেলার গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শেখ আমির উদ্দিন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন।

পিতার ইচ্ছায় তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু এখানে এসে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। মিশনারীদের প্রলোভনে পড়ে খৃষ্টান হলেন। ধর্মপ্রাণ বাবা, স্নেহময়ী জননী কাঁদতে লাগলেন, তবু তিনি তাঁর মতে অটল। তিনি বলেন--"আমার পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইত্যাদি অনেকেই আমার নিকটে আসিলেন এবং আমাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু আমার মন কিছুতেই তাহাদের কথায় প্রবোধ মানিল না। সুতরাং আমি আর বাটিতে ফিরিলাম না, আর কি ফিরিবার জো আছে? এদিকে যে মিশনারীদিগের মোহনমন্ত্র হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে।" তার মা-বাবা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসলেন। তিনি কারো কথা শুনলেন না। খৃস্টানদের আশ্রয় নিয়ে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করতে লাগলেন। তবে তিনি সে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খৃস্টান হওয়ার পূর্বে যদি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র সাথে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা হতো এবং তাঁর 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান' গ্রন্থখানা যদি তিনি পড়তে পারতেন তা হলে তিনি খৃস্টান হতেন না। তিনি ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর খৃস্টান সমাজভুক্ত হন। তারপর তিনি কৃষ্ণনগর থেকে প্রথমে কলিকাতার মির্জাপুর ও পরে এলাহাবাদ সেন্টপলস্ ডিভিনিটি কলেজে পড়াশুনা করে এইচ, জি, আর, ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা শেষে তিনি এলাহাবাদে কিছুদিন মিশনারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে তিনি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুসলমানকে খৃস্টান সমাজভুক্ত করতে সক্ষম হন। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা এবং শেষে শিকারপুরে আসলেন। এখানে মুনশী মেহেরুউল্লাহর সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী গ্রন্থ গভীরভাবে পড়তে থাকেন এবং অবশেষে আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসলেন এবং বললেন, "যখন বুঝিলাম যে, খৃস্টানদের এই অবস্থা তখন আর তিলার্ধ বিলম্ব না করিয়া খৃস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে ও মুসলমান ধর্মের স্বপক্ষে প্রচার আরম্ভ করিলাম। আমি খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইব এ কথা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন অনেক বড় বড় মিশনারী এ সংবাদে

দুঃখিত হইলেন ও আমাকে অনেক বুঝাইলেন। বিশেষ উন্নতি করিয়াও দিতে চাইলেন; কিন্তু আমি বলিলাম যে, 'দোদেল বান্দা কলমা চোর, না পায় বেহেস্ত না পায় গোর।' আমি যখন খৃষ্টান ধর্ম মানি না, তখন আর খৃস্ট সমাজে থাকিব না বলিয়া মিশনারী কার্য্য পরিত্যাগপূর্বক প্রিয় আত্মীয়-স্বজন সমক্ষে মৌলবী রেয়াজ-উল হক সাহেব কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হই।"

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে 'বাসনা'য় (১৩১৬, আষাঢ়) মন্তব্য করা হয়, "আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বল বিধানের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।" জমিরুদ্দিনের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আমাদের জীবন সাহিত্যের ধারার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁর এই গ্রন্থের ভাষা বেশ আবেগবান, তথ্যবহুল, সুপাঠ্য ও সাহিত্য গুণসম্পন্ন ।

Glory of Islam (1929) গ্রন্থটি মূলত বিধর্মীদের উদ্দেশে রচিত। তবুও এই গ্রন্থটি জীবনী সাহিত্যের ধারায় আলোচনা করতে পারি। এই গ্রন্থের মূল প্রবন্ধটি হচ্ছে 'From Christianity to Islam,' এই প্রবন্ধটি জমিরুদ্দিনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরাজী রূপান্তর। তিনি সহজ ভাষায় তার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন এই প্রবন্ধে। তাছাড়া এই গ্রন্থে কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এসব প্রবন্ধে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার মাধ্যমে বিধর্মীদের এই ধর্মে আসার আহবান জানানো হয়।

জমিরুদ্দিনের বেশ কিছু জীবনী সাহিত্য তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করা বেশ কষ্টকর। কারণ দেশে মুসলিম পরিচালিত পত্রপত্রিকা তেমন সংগ্রহ করা হয়নি। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায় 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় জমিরুদ্দিন লেখেন 'মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী'। এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, প্রথম জীবনে নৈমুদ্দীন সাহেব একটি গ্রাম্য

পাঠশালায় শিক্ষকতা করতেন। একদিন তিনি ভাওয়ালের অন্তর্গত কোন একটি স্থানে এক বিবাহ সভায় যান। সেখানে বিয়ের কাবিনের শর্ত নিয়ে বর ও কনে পক্ষের বিবাদে তিনি কথা বলতে গেলে একজন বলেন, 'জাতীয় বিদ্যায মূর্খ, পাঠশালার পণ্ডিতের কাবিনের সর্ত সমন্ধে কোন কথা বলবার অধিকার নেই।' এই শ্লেষবাক্যে তাঁর মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং তিনি স্ত্রী–পুত্রকে ফেলে রেখে মুর্শিদাবাদ চলে যান। সেখানে তিন বছরের মধ্যেই তিনি মিজান থেকে হেদায়া পর্যন্ত পড়ে বাড়ি আসেন এবং এসলাম ধর্ম প্রচার কার্যে ব্রতী হন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি 'লা–মজহাবীদের সঙ্গে বাহাছ' করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুকাল পর তিনি সিরাজগঞ্জের ম্যারেজ রেজিস্টার নিযুক্ত হন এবং অধীনস্থ কর্মচারীদিগের দুরভিসন্ধি বুঝতে না পেরে আইনের অভিপ্রায়ের তারতম্য মতে কাজ করায় তাকে দেড় বছর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই দেড় বছর তিনি পাবনার জেলে অবস্থান করেন। ১৩২৯ সনে করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী তাকে ফতোয়ায় আলমগিরির অনুবাদের কাজে মাসিক ২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন এবং সেই থেকেই তিনি করটিয়া থেকে নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করে সমাজের উপকার করতে থাকেন। জমিরুদ্দিনের এই প্রবন্ধে নৈমুদ্দীনের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যায় । তাঁর এই প্রবন্ধের ভাষা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুখপাঠ্য।

ইসলাম প্রচারকের ১৯০১ খৃস্টাব্দের নভেম্বর–ডিসেম্বর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। গিরীশচন্দ্রের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক শেখ জমিরুদ্দিন বলেন, "ইসলাম প্রচারকের পাঠকবর্গ মনে করতে পারেন যে, ইসলামী কাগজে ব্রাহ্মের জীবনী কেন? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের ইতিহাসের সহিত গিরীশবাবুর জীবনীর বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই আজ ইসলাম প্রচারকে তাঁহার জীবনী প্রচার হইল। বঙ্গদেশে খৃস্টান মিশনারীরা অনেকদিন

হইতেই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন ও শত শত মুসলমান যুবক গিরীশ বাবুর 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরীফ' ও 'হযরতের জীবনী' হস্তে পাইয়াছে, 'মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী', 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী' শুধু নয় এমনি বেশ কিছু জীবনীমূলক প্রবন্ধ তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে।

জমিরুদ্দিন মুখ্যত ইসলাম প্রচারক হলেও; তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্ম ও জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি পাঠক সমাজের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তার জীবনী সাহিত্যের মধ্যে 'মেহের চরিত' ও 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' নিঃসন্দেহে দুটি স্মরণীয় গ্রন্থ। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফসল 'চরিত সাহিত্য'।

খ. অনুবাদ সাহিত্য

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের রচনাবলীর মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। তিনি বিভিন্ন ভাষা থেকে ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা)-এর উপর লিখিত বিধর্মী খ্যাতনামা পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেন। তিনি এই অনুবাদমূলক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম সত্যের ধর্ম, ন্যায়ের ধর্ম ও শান্তির ধর্ম। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত পণ্ডিতরাও তাই এই ধর্মের ও মুহাম্মদ (সা)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মুসলমানদের দুর্যোগপূর্ণ সেই মুহূর্তে জমিরুদ্দিন চেয়েছিলেন খৃস্টান মিশনারীদের উদ্ভট প্রশ্নের উত্তর ও প্রতিবাদ নিজের কথায় না দিয়ে তাদেরই ধর্মাবলম্বী ভাই-বন্ধুদের লেখার মাধ্যমে দিতে। জমিরুদ্দিন তাঁর অনুবাদমূলক গ্রন্থাবলী রচনা করে সেই ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদমূলক গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইসলামী বক্তৃতা' (১৯০৭), 'ইঞ্জিলে

মোহাম্মদ (দ) ও পাদ্রী বাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩২), 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বী-দিগের মন্তব্য' (১৩০৭) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

'ইসলামী বক্তৃতা' গ্রন্থটি 'খ্রীশ্চিয়ানিটি এ্যান্ড ইসলাম' নামক ইংরাজী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। গ্রন্থটি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পাঁচ পরিচ্ছেদে ইসলাম সম্বন্ধে ক্যাননন, আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস ও কার্লাইলের এবং ফারাক্লিত সম্বন্ধে ভূতপূর্ব পাদ্রী জন আবদুল্লাহ্র বক্তৃতার মর্ম সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন অংশে জমিরুদ্দিন বলেছেন, "খ্রীশ্চিয়ানিটি ও ইসলাম নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া সময় সময় 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশ করা গিয়াছিল।" ৫৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৩১৪ সনের মাঘ মাসে (ইং ১৯০৭)। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৭ সনে, তৃতীয় ১৩২২ সনে এবং চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৩৩২ সনে। চতুর্থ সংস্করণটি প্রকাশ করেন নদীয়া থেকে শেখ আজিজুদ্দীন। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে। গ্রন্থটির প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের সংখ্যাধিক্য থেকে মনে হয় গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধ ফারাক্লিত সম্বন্ধে পাদ্রী জন আবদুল্লাহ সাহেবের বক্তৃতা 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৫ম বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যায় (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০৩) মুদ্রিত হয়েছিল, এই গ্রন্থের মূল ইংরাজি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় Asiatic Quarterly Review পত্রিকার ১৮৮৮, অক্টোবর সংখ্যায়। এই পত্রিকা থেকে শেখ জমিরুদ্দিন প্রবন্ধটি বাংলায় ভাষান্তরিত করেন। পরবর্তীকালে ইংরাজি মূল প্রবন্ধ জমিরুদ্দিনের Glory of Islam পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পঞ্চম প্রবন্ধ 'সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কার্লাইলের বক্তৃতা' ইসলাম প্রচারক, ৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩) মুদ্রিত 'টমাস কার্লাইল ও ইসলাম'-এর অংশ

বিশেষ। এই অংশটি পুনরায় রদ্দে খৃষ্টান পঞ্চম পুস্তিকায় (ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য) সংযোজিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'বাসনা' পত্রিকায় মাঘ–চৈত্র ১৩১৫ সংখ্যায়।

'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দ) ও পাদ্রী বাউস সাহেবের সাক্ষ্য' গ্রন্থটি হযরত মোহাম্মদ (দ)–এর আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভভিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত প্রবন্ধের অনুবাদ। জমিরুদ্দিন এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন, "ইহার দ্বারা যদি একটি খৃষ্টানেরও হযরত মোহাম্মদের (দ) উপর বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিব।" এই অনুবাদ জাতীয় গ্রন্থটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৩৩২ সনে কলকাতা থেকে।

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' এই বইতে জমিরুদ্দিন বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকা থেকে ইসলাম সম্বন্ধে কতিপয় অমুসলমান ব্যক্তির অভিমত সংকলন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী 'ইউনিটি ও মিনিষ্টার' সম্পাদক রেভাঃ মহেন্দ্রনাথ বসু, টমাস কার্লাইল, অধ্যাপক টমাস আরনল্ড, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ। সংকলন কার্যে জমিরুদ্দিনকে উৎসাহিত করেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ এবং কতিপয় মুসলমান ধর্ম বন্ধু। বিভিন্ন সংস্করণের বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায় যে, বইটি পাঠক সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

তাছাড়া তৎকালীন মুসলিম পরিচালিত বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর কিছু অনুবাদমূলক সাহিত্য ছড়িয়ে আছে, যেমন 'ফারাক্লিত' (ইংরেজী থেকে অনূদিত ইসলাম প্রচারক নভেম্বর–ডিসেম্বর ১৯০৩), 'ইসলাম সম্বন্ধে টেলার সাহেবের বক্তৃতা' (ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম

সংখ্যা)। 'ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা' (ইসলাম প্রচারক ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম–২য় সংখ্যা), 'টমাস কার্লাইল ও ইসলাম' (ইসলাম প্রচারক, মার্চ–এপ্রিল, ১৯০৯) প্রভৃতি।

গ. কবিতা ও গযল

মুন্সীজীর সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা কবিতা ও গযল। তাঁর কবিতা ও গযল সহজ সরল বক্তব্যপ্রধান ও হৃদয়স্পর্শী। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'শোকানল'। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সনে। তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'কোথা চলি গেলে' (১৩০৮)। তিনি তাঁর কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

"অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা , ত্বরা করি যাই তব পাশ,
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন,
তব সনে হয় মোর বিবাহ বন্ধন।
সেই প্রেম–সম্মিলনে
এক সঙ্গে দুইজনে
সুখ–দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল...
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার
স্ত্রৈণ বলি পাছে হই ঘৃণিত সবার।" (কোথা চলি গেলে)

কবিতাটি তাঁর প্রথমা পত্নীর উদ্দেশে রচিত। দ্বিতীয় পত্নীর পিতাকে সম্বোধন করে একটি কবিতা লেখেন ঃ

"কেমনে ভুলি পিতঃ! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি
পক্কদাড়ী সুবদন, সুসুন্দর ও গঠন
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?" (শোকানল)

বিদ্যাবিনোদ কবিতার পাশাপাশি মুসলিম জাগরণমূলক কিছু গযল রচনা করেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গযল সংকলনের নাম 'আসল বাংলা গজল' (১৯১৫)--এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গযল সংকলন। গ্রন্থটির নবম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, চার বছরের মধ্যে প্রায় পঁচিশ হাজার পুস্তক বিক্রি হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় জমিরুদ্দিন বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেনের 'বাঙালা মৌলুদ শরীফ' পাঠ করে তাঁর ও মুনশী মেহেরুল্লাহ'র গযল লেখার আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন সভায় পঠিত এই সব গযল জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি এই সংকলন প্রকাশ করেন। আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থের কিছু গযল, হুলিয়ানামা, দরূদ শরীফ ও মুনাজাত বার বার উচ্চারিত হতে শোনা যায়। 'আসল বাংলা গজল' গ্রন্থে গযল আছে ১৮টি এবং 'হযরত মোহাম্মদ' (দ.)–এর হুলিয়া শরীফ', দরূদ শরীফ ও দুটি মুনাজাত স্থান পেয়েছে।

এই সব গযলের মাধ্যমে জমিরুদ্দিন ইসলামের ইতিহাস–ঐতিহ্য, আদর্শ–উদ্দেশ্য মুসলিম সমাজের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এই গ্রন্থে ৫৬ লাইনের একটি 'হযরত মোহাম্মদ (দ)–এর হুলিয়া শরীফ' স্থান পেয়েছে। তার কয়েকটি লাইন তুলে দেয়া হলো ঃ

আল্লা আল্লা বল বান্দা নবী কর সার।
মোহাম্মদের দীন বিনা রাহা নাহি আর।।
মোহাম্মদের চারি ইয়ার নাম তার শুন।
আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী চারিজন।

এই চারির কম যেই উম্মতে জানিবে।
মোহাম্মদের শাফাৎ হতে দূর হয়ে যাবে।
মোহাম্মদের হুলিয়া পড়ি কান দিয়া শুন।
দেলে একিন করে পড়ে তাতে ইমান আন।।
মোহাম্মদের হুলিয়া যেবা , সোরেশাম পড়িবে
আখেরে দোজখের আগুন তাকে হারাম হবে।

বিদ্যাবিনোদের এই হুলিয়া শরীফটি মুসলিম বাংলার অসংখ্য নর-নারীর মুখস্থ রয়েছে। এই হুলিয়া শরীফে তিনি হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর চার ইয়ারের গুণগান গেয়েছেন। 'আসল বাংলা গজল' গ্রন্থে শুধু বিদ্যাবিনোদের গযল, হুলিয়ানামা, দরূদ শরীফ ও মুনাজাতই স্থান পায়নি, তৎকালীন মুসলিম বাংলার কয়েকজন প্রখ্যাত গযল রচয়িতার কয়েকটি গযলও স্থান পেয়েছে। মুনশী মেহেরুল্লাহ সাহেবের দুটি, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, দেওয়ান শামসুদ্দিন, সলিমুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়ার একটি করে গযল এতে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়েছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবন সংগীত) এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের একটি লেখা।

ঘ. ভ্রমণ সাহিত্য

জমিরুদ্দিনের বেশকিছু ভ্রমণকাহিনী তৎকালীন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলা-আসামের জেলায় জেলায় ইসলামী বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে বেড়ান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তাঁর যে নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তার এই ভ্রমণমূলক রচনাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 'মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (ইসলাম প্রচারক--অক্টোবর ১৯০৪), 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ' (ইসলাম প্রচারক-৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), 'পশ্চিম ভ্রমণ' (ইসলাম প্রচারক ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা), 'দার্জিলিং ভ্রমণ' (১৩১৬ বৈশাখ-বাসনা), মুর্শিদাবাদ

ও পলাশী ভ্রমণ (বাসনা–জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) সহ বেশ কিছু ভ্রমণ বিষয়ক রচনাবলী তিনি তৎকালীন সাময়িক পত্রের জন্যে লিখেছেন।

বিদ্যাবিনোদের ভ্রমণকাহিনী মূলুক রচনায় মুসলিমপ্রধান এলাকায় মানুষের অভাব–অভিযোগ, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবস্থা, তাদের জীবনযাত্রার মান, দর্শনীয় স্থান, তাঁর ইসলামী সভার বর্ণনা ও ইসলামী অন্দোলনের বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাঁর এই শ্রেণীর রচনায় তৎকালীন মুসলিম বাংলার সামগ্রিক চিত্র খুঁজে না পাওয়া গেলেও অংশ বিশেষ অবশ্যই খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিদ্যাবিনোদ শুধু ইসলাম প্রচারক এবং বাংলা সাহিত্যের একজন লেখকই ছিলেন না, তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন।

ঙ. ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক রচনাবলী

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ে বেশ কিছু রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর এই শ্রেণীর রচনাবলী ইতিহাস–ঐতিহ্য বিষয়ে তার উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ। তিনি এই শ্রেণীর রচনাবলী প্রকাশ করার মাধ্যমে ঘুমন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজকে তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। ‘ইসলামের সভ্যতা’ জঙ্গে কারবালা (১৯০৪) , ‘জওয়াবান্নাছায়া’, গৌড়ের ইতিহাস প্রভৃতি এই ধারায় রচিত গ্রন্থ মুসলিম পরিচালিত ‘ইসলাম প্রচারক’, ‘সুধাকর’, ‘মিহির’ ‘নবনূর’সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তার কিছু রচনা প্রকাশিত হয় ।

চ. শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের আন্দোলনে বিদ্যাবিনোদ ছিলেন উৎসাহী কর্মী। তিনি এ

দেশীয় মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর সমাজ কল্যাণমূলক রচনাবলীর মাধ্যমে মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্লেদ ও কুসংস্কার দূর করতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক রচনা প্রকাশ পায়। তার বিশুদ্ধ খতনামা (পঞ্চম সংস্করণ ১৩৩৪), 'পদ শিক্ষা ব্যাকরণ' (১৮৯৭); 'উপদেশ ভান্ডার', 'দুইশত উপদেশ', 'খোশ গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থ এই শাখার উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর বিশুদ্ধ খতনামা (১৩৩৪) গ্রন্থটি মুসলমান ছেলে–মেয়েদের আদর্শ পত্র রচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। এই গ্রন্থে তিনি সুন্দরভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে মুসলমানী কায়দায় কিভাবে চিঠি লিখতে হয়, তা উদাহরণসহ আলোচনা করেছেন। পত্র লেখকদের প্রতি উপদেশ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মুসলমানের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই। উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ।" গ্রন্থটিতে পিতাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা এভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ

"বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম/জোনাব মুন্সী আনারুদ্দিন আহ্মদ সাহেব পাক জনাবেষু।" স্ত্রীকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

"বেয়াপ্তনিহিতালা সানাহ বানাজাদে বানুয়ে/দামসাদ হামদাম ও হায়বাজ ইয়ানে/ নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহ্তালা/বিবি নছিরুন্নেসা খাতুনে জান্নাত।"

মুন্সীজীর 'বিশুদ্ধ খতনামা' গ্রন্থটি সম্বন্ধে তৎকালীন 'বাসনা' পত্রিকায় বলা হয়, "পাড়াগাঁয়ের মুসলমান ছেলেরা, যে সকল বালক অর্থাভাবে নিরন্ধন গ্রাম্য প্যাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হয়, তাহাদের জন্য এই পুস্তক উপকারী হইবে।"

জমিরুদ্দিন ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' (৫ম বর্ষ, ৭ম–৮ম সংখ্যা,

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০) নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ-পনর লক্ষ মুসলমানের কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুল মহিলা নির্ম্মম অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলংকিনী নর পিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিম সেবন, কেহ বা অন্য উপায় আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে।...বর্তমান বহু বিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছু নেই, যেহেতু মুসলমানগণ দিন দিন ব্যয়াধিক্য বশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে । তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে। তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলংকিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধে তিনি এ দেশীয় অত্যাচারিত মুসলিম রমণীদের চিত্র অতি বাস্তবভাবে তুলে ধরেছেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করে তার সমাধান করার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন।

মুন্সীজী তাঁর 'পদশিক্ষা ব্যাকরণ' (১৮৯৭), 'উপদেশ ভান্ডার', 'দুই শত উপদেশ' 'খোশ গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান ছেলে-মেয়েদের আদর্শ মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক রচনার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের গতানুগতিক ধারাকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

ছ. বিধর্মীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লিখিত রচনাবলী

জমিরুদ্দিন ইসলাম ধর্মের প্রতি বিধর্মীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে অসংখ্য লেখালেখি করেন। কেবলমাত্র খৃষ্টান মিশনারীদের আক্রমণের

বিরুদ্ধে তিনি মোট ১০৮টি পুস্তিকা রচনা করেন।[৮] মিশনারীদের প্রচারের বিরোধিতা করে জমিরুদ্দিনের লেখা 'রদ্দে খৃস্টান' পুস্তিকা মালার ১৪টি পুস্তিকা তৎকালীন সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। 'রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলাম' (১৩৩২), 'হযরত ঈসা কে?' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৩), 'ইস্‌লামী বক্তৃতা' (১৯০৭), 'পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন' (১৩৩৪), 'ইঞ্জিলে মোহম্মদ (দ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩২), 'হযরত বার্নার ইঞ্জিলে পেশ খবর' (পৃঃ ১২), 'আসল বাইবেল কোথায়?' (১৩২৭), 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দ)' ও 'পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন' (১৯১৬), 'মাসুম মোস্তফা', 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' (১৯০০) প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধারার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

'রদ্দে সত্য ধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলাম' (১৩৩৪) গ্রন্থটি নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের জনৈক পাদরী রচিত 'সত্য ধর্ম্ম নিরূপণ' গ্রন্থের প্রতিবাদে রচিত। 'সত্য ধর্ম নিরূপণ' গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরীনির্যাতক বলে চিত্রিত করে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর ভাষায় কোরানের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম। এর প্রতিবাদেই মুন্সীজী এই গ্রন্থটি রচনা করেন। 'সত্য ধর্ম্ম নিরূপণ' সম্পর্কে তৎকালীন মুসলমান পরিচালিত সাময়িক পত্রে আবেদন ও প্রতিবাদ প্রকাশিক হয়। এই সমস্ত রচনায় বাংলা সরকারেও টনক নড়ে এবং তারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ঃ

The attention of the Government has been drawn to an article which appeared in the 'Mussalman' of February, 1925 entitled `Malisious attack on the Holy prophet...... on securing a copy of the book, the Government have learnt that it was published in

1899, the Govt. has also been informed that it has been out of print for 15 years....।

মুন্সীজী তাঁর 'হজরত ঈসা কে?' (১৯২৬) গ্রন্থটিতে বুঝিয়েছেন হযরত ঈসা বা যীশু খৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নন, ঈশ্বরের পুত্রও নন, আমাদেরই মতো ঈশ্বরের বান্দা মাত্র। এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন ঃ "ইসাই বা খ্রীস্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে, হজরত ঈসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর স্বয়ং জগৎ পিতা ঈশ্বর, ... ইঞ্জিলে জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, আদম ঈশ্বরের পুত্র, (দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ)। এখন কি আমরা বলি যে আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকিত? সত্য, যদি প্রেরিতগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়, কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারে না (২১–২২)।

মুনশী মেহেরউল্লাহর অনুরোধে জমিরুদ্দিন এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, ইউনিটেরিয়ান মিশনারী পাদরী আকবর মসীহ–এর উর্দু পুস্তক 'উলুহতে মসীহ' অবলম্বনে তিনি 'হজরত ঈসা কে' পুস্তিকা রচনা করেন। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল হজরত ঈসার ঈশ্বরত্ব বিচার করা। কেননা, তিনি খোদা কিনা, এ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কারণ তিনি যদি খোদা না হন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের উপাসনা না করা কর্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে না জানিয়া হযরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।" এই গ্রন্থে নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তি–তর্কের দ্বারা জমিরুদ্দিন প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) কদাচ খোদাতা'আলা নন। তিনি বাস্তবিক খোদাতা'আলার সৃষ্ট একজন শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য মাত্র। 'বাসনা' (১৩১৬, আষাঢ় সংখ্যা) পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে বোধ হয় অনেক ভ্রান্ত খৃষ্টান ও অনেক অজ্ঞ মুসলমানের চোখ

ফুটিবে। ধর্ম্ম জীবনে সাফল্য লাভ প্রয়াসী প্রত্যেক খৃষ্টানের যেমন ইহা অবশ্য পাঠ্য, আত্মরক্ষার জন্য তেমনই ইহা সকল মুসলমানের নিত্য আদরে পঠিতব্য; 'হজরত ঈসা কে?' পুস্তিকার প্রথম দুটি অধ্যায় 'প্রভু যিশু খৃষ্ট কে'? এই শিরোনামে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় (আগস্ট ১৮৯১) মুদ্রিত হয়েছিল।

তাঁর 'পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' গ্রন্থটি পাদরী মনরো রচিত 'মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' গ্রন্থের প্রতিবাদে রচিত হয়। পাদ্রী মনরো তাঁর গ্রন্থে মুহাম্মদ (সা)-কে কলংকিত ও পাপী বলে বর্ণনা করেন। মুন্সীজী তাঁর গ্রন্থে পাদরী মনরো সাহেবের অভিমত খন্ডন করে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হলেন এবং বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালেন যে, যীশু খৃষ্ট নিজেও নিষ্পাপ ছিলেন না।

বিদ্যাবিনোদের 'শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। মুহাম্মদ আবদুল হাই এই গ্রন্থটিই জমিরুদ্দিনের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে উল্লেখ করেছেন।[৯] এই গ্রন্থটিতে একদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী আলোচনা ও মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদিকে তিনি খৃষ্টান পাদরীরা কিভাবে মুসলমানদের ধোঁকায় ফেলে খৃষ্টান করতো তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

মুন্সীজী তাঁর 'মাসুম মোস্তফা (দ)' গ্রন্থটিতে হযরতকে নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন করেছেন। খৃষ্টান মিশনারী পাদ্রিগণ বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা রচনা[১০] করে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে গোনাহ্‌গার সাব্যস্ত করার বিশেষ চেষ্টা করেন। পাদরীদের প্রচারণার উত্তরে রচিত হয় জমিরুদ্দিনের 'মাসুম মোস্তফা (দ)' । এই পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন ঃ "অন্তিম নবী হজরত মোহাম্মদ (দ)-এর নিষ্পাপ থাকা বা না থাকা প্রশ্ন লইয়া বর্তমান কালে যেন একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দ.)-এর নিষ্পাপ থাকা সম্বন্ধে কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে

পাদ্রী সাহেবরা কোরান শরীফের কয়েকটা আয়াতের অযথা ব্যাখ্যা এবং তদসম্বন্ধে অযথা মত প্রকাশ করতঃ বর্তমান আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।" বাইবেল এবং কুরআন থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি প্রদান করে লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুস্তকের উপসংহারে পাদরীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "প্রিয় পাদ্রী মহোদয়গণ! অকারণে জগতের একমাত্র নিষ্কলঙ্ক পরিত্রাণ কর্ত্তাকে পাপী বলিয়া নিজে আর পাপ করিবেন না। হজরতকে পাপী বলিলে আপনাদের যিশুও পাপী হইবেন, তাহা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আশা করি আমার লিখিত এই বিষয় চিন্তা সহকারে পাঠ করিবেন, এবং হজরতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অসীম পুণ্যের ভাগী হইবেন। যে কেহ হজরত মোহাম্মদের (দ) ওপর বিশ্বাস করিয়া ঈমান আনিবে সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবে সে দোজখে যাইবে। দোওয়া করি, খোদাতায়ালা যাবতীয় খৃষ্টান নর-নারীকে পবিত্র ইসলামের আশ্রয় দান করুন।" খৃষ্টান পাদ্রীদের সাথে তর্ক বিষয় তথ্য সন্নিবেশের দিক থেকে 'মাসুম মোস্তফা (দ)'-র ভূমিকাংশ বিশেষ মূল্যবান।

বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে রচিত মুন্সীজীর অসংখ্য প্রবন্ধ তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে (ইসলাম প্রচারক-সেপ্টেম্বর-আক্টোবর-১৯০১), বাইবেল আপনি আমার বিরুদ্ধে (ইসলাম প্রচারক জুলাই-১৮৯৯), বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা (ইসলাম প্রচারক ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা), হযরত মোহাম্মদের (দ.) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য (ইসলাম প্রচারক নভেম্বর-১৯০৪, জানু-১৯০৫, ফেব্রু-১৯০৫), বার্নবার ঈঞ্জিল (ইসলাম প্রচারক জুন-১৯০৫), খৃষ্ট ধর্ম রহস্য (ইসলাম দর্শন-ফাল্গুন, ১৩২৭), বাইবেলে বহু বিবাহ (ইসলাম প্রচারক-৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা), বাইবেল তত্ত্ব (তবলীগ অগ্রহায়ণ-১৩৩৪, মাঘ-১৩৩৪, ফাল্গুন-১৩৩৪), ঈছায়ী

ক্রীড়া (শরিয়তে এসলাম অগ্রহায়ণ–১৩৩৭), আর্য্য ভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা (শরিয়তে এসলাম–জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪), স্বামী সদানন্দের 'শয়তানী ও ইসলামে ভীষণ আঘাত' (রওশন হেদায়েত চৈত্র–১৩৩২)।

'বাইবেলে বহু বিবাহ' প্রবন্ধে জমিরুদ্দিন বলেছেন ঃ "খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারকেরা প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, কোরান শরীফ বহু বিবাহের প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু পবিত্র ধর্ম্ম পুস্তক অর্থাৎ বাইবেল একটি মাত্র দার পরিগ্রহ করিতে আদেশ দিয়া থাকেন। যাঁহারা বাইবেল পড়িয়াছেন, তাঁহারা যে কেমন করিয়া ঐ প্রকার কপটতাপূর্ণ বাক্য বলিয়া লোকদিগকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যান, তাহা বুঝিতে পারি না। বাইবেল ও পবিত্র কোরান শরীফের মধ্যে যে যে স্থানে বহু বিবাহের কথা লেখা আছে সেই সেই স্থান আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা পাঠ করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন যে, কে বহু বিবাহের প্রশ্রয় দেয়, কুরআন না বাইবেল।"

স্বামী সদানন্দের 'শয়তানী ও ইসলামে ভীষণ আঘাত' প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন ঃ "সম্প্রতি স্বামী সদানন্দ 'সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা' নামে একখানি ইসলাম বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া ইসলামে ভীষণ আঘাত করিয়াছেন।.....এই প্রকার বিষ্ঠাবমন করিয়া স্বামীজীর কি লাভ হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তবে এই প্রকার ইসলাম বিদ্বেষপূর্ণ বাদঘ্য পুস্তক প্রচারে হিন্দু–মুসলমানে বিরোধ ঘটাইয়া শান্তিভঙ্গ হইতে পারে ইহা নিশ্চয়।" তিনি এখানে স্বামী সদানন্দের রচনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তার সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।

'প্রভু যীশু খৃষ্ট কে'? প্রবন্ধে মুন্সীজী উল্লেখ করেন ঃ "ইসাইগণ যে ইসাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন, জিজ্ঞাসা করি, হজরত ইসা কি কখনও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? না কদাচ নয়। বরং তাহার বিপরীত কথায় বাইবেল খানি পরিপূর্ণ। ঐ অসঙ্গত উক্তিটি কেবল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কল্পিত ভিন্ন আর

কিছুই নহে।..... অতএব হে খ্রীস্টবাদীগণ আইস, যিনি অনাদি, অনন্ত, স্বয়ং ইসা যাঁহার আশ্রয় লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিমান স্বয়ংজীবি খোদাতালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর।”

তাঁর বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে রচিত গ্রন্থাবলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি বিধর্মীদের প্রতিবাদের উত্তর নিজের ভাষায় না দিয়ে, তাদের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ ও তাদের স্বজাতি ভাইদের কথার মাধ্যমে দিতে চেষ্টা করেছেন। মুন্সীজীর রচনাবলী ইসলাম ধর্মের প্রতি বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে রচিত।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ মুসলমানদের একটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী ধারার অন্যতম প্রধান শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তিনি সেদিন তাঁর ইসলামী বক্তৃতা ও সাহিত্য রচনার দ্বারা ঘুমন্ত বাঙালি মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। মুসলিম বাংলার ধর্মীয়, সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যা-বিনোদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জমিরুদ্দিনের সমসাময়িক যুগে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যধর্মী ধারায় অনেক মুসলিম সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২–১৯১৬), মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ (১৮৬১–১৯০৭), কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫২), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯–১৯৩১), রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯–১৯১৯), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮–১৯১২), মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২–১৯৩৩), মওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০), ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪–১৮৯০), দাদ আলী (১৮৪২–১৯৩৬), দীন মোহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৫৩–১৯০৬), মোজাম্মেল হক (১৮৬০–১৯০৩) প্রমুখ মনীষী।

পরবর্তী পর্যায়ে বেশ কিছু মুসলিম কবি-সাহিত্যিক এই ধারায় সাহিত্য চর্চা করে সাহিত্যের এই অধ্যায়টি আলোকিত করে তোলেন। তন্মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ কৃত 'কোরানের বঙ্গানুবাদ', মোস্তফা চরিত (১৯২১), শেখ ফজলুল করিমের (১৮৮২-১৯৩৬) আসবাত-উস-ছামার বঙ্গানুবাদ ছামাতত্ত্ব, হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ও হজরত এমাম রাব্বানী সাহেবের জীবনী, গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) 'বিশ্বনবী' সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৭৯-১৯৩১) স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা, আদব কায়দা শিক্ষা, তুর্কী নারী জীবন, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'শেষ নবীর সন্ধানে' 'ছোটদের রসূলুল্লাহ (দ.)' ও 'ইসলাম প্রসঙ্গ', কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) 'মরুভাস্কর', রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ', 'কাব্যে আমপারা' মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬-১৯৫৪) 'মরুভাস্কর', সৈয়দ এমদাদ আলীর (১৮৭৬-১৯৫৬) 'তাপসী রাবেয়া', শেখ আব্দুল জব্বারের (১৮৮১-১৯১৮) 'শরীফের ইতিহাস', এয়াকুব আলী চৌধুরীর (১৮৮৬-১৯৩৮) 'মানব মুকুট,' নূরনবী' 'শান্তিধারা' ও 'ধর্মের কাহিনী,' শেখ হাবিবুর রহমানের 'ইসলাম ধর্মতত্ত্ব', গুলিস্থান ও বোস্তানসহ অসংখ্য গ্রন্থ ও লেখক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুন্সী জমিরুদ্দিন ও মুনশী মেহেরউল্লাহ বাংলা সাহিত্যে যে ধারার সূচনা করেছেন, সেই ধারা উপরোক্ত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

পাদটীকা

১. বাংলা সাহিত্যে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ-মুহাম্মদ রবীউল আলম, সচিত্র বাংলাদেশ, ৩রা মার্চ ১৯৮৫ সাল।

২. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ঃ দেশ-কাল-সমাজ, মুহাম্মদ আবূ তালিব প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর-১৯৮৩ পৃঃ ১, ঢাকা।

৩. পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি পৃষ্ঠা ১৭

৪. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৯৪

৫. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২২
৬. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২২
৭. পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২০
৮. কর্মবীর মুনশী মেহেরউল্লাহ ঃ হাবিবর রহমান, পৃষ্ঠা ৩২, কলকাতা, ১৯৩৪ সাল।
৯. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক)।
১০. কাজী ফাণ্ডার রচিত 'মিজানুল হক', পাদ্রী বাউস রচিত 'ইসা বা মোহাম্মদ' পাদ্রী যাকোব কান্তিনাথ বিশ্বাস রচিত 'ইসলাম দর্শন', গোল্‌ড রচিত 'ইসলামে মোহাম্মদ' পাদ্রী মৌলবীদিগের শিক্ষা,' পাদ্রী ইমাদ উদ্দীন রচিত 'তাওয়ারিখে মোহাম্মদী', পাদ্রী সফদার আলী রচিত 'নিয়াজনামা', পাদ্রী ঠাকুর দাস রচিত 'সিরাত মোহাম্মদ' ইত্যাদি।

জমিরুদ্দিন ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

তৎকালীন বিভিন্ন মুসলিম লেখক পরিচালিত পত্রপত্রিকার সাথে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মুন্সীজী এসব পত্রপত্রিকায় খৃষ্টানদের আক্রমণের বিরোধিতা করে এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য উল্লেখপূর্বক মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার জন্যে অসংখ্য লেখালেখি করেছেন। এসব পত্রপত্রিকায় শুধু তাঁর লেখাই ছাপা হতো না, এছাড়া ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচী বিস্তারিত সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতো।

মুসলিম পরিচালিত এসব পত্রপত্রিকায় মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনসহ তৎকালীন অসংখ্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও লেখক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখতেন। এসব পত্রপত্রিকা কুরআন-হাদীস-তফসীরের বঙ্গানুবাদ, রসূল, খলীফা, ইমাম প্রমুখের জীবন চরিতালোচনা, ইসলামের শিক্ষা, ইসলাম প্রচারের সমকালীন সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। এ ছাড়া বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে তুরস্ক সম্পর্কে সচেতন আগ্রহ জাগ্রত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রচারকর্মী এবং সাময়িক পত্র এই দুই শক্তির সমন্বিত সাধনায় উদ্বোধিত হয়েছে এ যুগের বাঙালি মুসলমানের চিত্ত। ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাংলা সহিত্যে মুসলিম সাধনা' গ্রন্থে এসব পত্রপত্রিকার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি সাধন করতে এই পত্রিকা প্রকাশকে মনে করেছিলেন সামাজিক কার্য।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন 'ইসলাম প্রচারক'সহ 'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর', 'প্রচারক,' নবনূর', 'কোহিনূর', 'ইসলাম দর্শন,' 'বঙ্গনূর' 'শরিয়ত,' 'শরিয়তে এসলাম', 'তবলীগ' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় সব সময়ে লিখতেন, তবে ইসলাম প্রচারকের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ।

ইসলাম প্রচারক

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'ইসলাম প্রচারক' সাহিত্য মাসিক প্রকাশ করেন। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন এই পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশের সময় এর আদর্শ সম্পর্কে যে দীর্ঘ সূচনা লিখিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, 'ইসলাম প্রচারক' যাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের কার্য করতে পারে সে সম্বন্ধে যত্ন–চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না।' এই পত্রিকায় মুন্সীজীর অসংখ্য প্রবন্ধসহ বিভিন্ন লেখা গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়েছিল। তবে বর্তমানে পত্রিকায় প্রকাশিত সবগুলো লেখা কিংবা তার শিরোনাম খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও কয়েকটি লেখার শিরোনাম উল্লেখ করা হলো।

১. 'বাইবেল আপনি আমার বিরুদ্ধে'–জুলাই ১৮৯৯।
২. 'বাইবেল যুদ্ধ ও জীবহত্যা' নভেম্বর–ডিসেম্বর (১৮৯৯), জানুয়ারী ১৯০০, মার্চ–এপ্রিল ১৯০০ ও মে–জুন ১৯০০।
৩. 'প্রভু যীশু খৃষ্ট কে'–আগস্ট ১৮৯৯।
৪. 'বাইবেলে বহু বিবাহ'–সেপ্টেম্বর ১৮৯৯।
৫. 'মৌলবী নৈমুদ্দিন সাহেবের জীবন ও কর্ম' সেপ্টেম্বর–অক্টোবর ১৯০১।
৬. 'পারস্য কবিদ্বয়ের বিবরণ' সেপ্টেম্বর –অক্টোবর ১৯০১।
৭. প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে–ঐ।
৮. 'শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের জীবনী' নভেম্বর–ডিসেম্বর–১৯০১।
৯. 'টমাস কার্লাইল ও ইসলাম' মার্চ–এপ্রিল ১৯০৩।
১০. 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' জুলাই–আগস্ট ১৯০৩।

১১. ফারাক্লিত (ইংরেজি থেকে অনূদিত) নভেম্বর–ডিসেম্বর ১৯০৩।
১২. 'ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা' মে–জুন ১৯০৪।
১৩. 'ইসলাম সম্বন্ধে টেলার সাহেবের বক্তৃতা' সেপ্টেম্বর ১৯০৪।
১৪. 'মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত' অক্টোবর, ১৯০৪।
১৫. হযরত মোহাম্মদের (দ) নবুয়ত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য– নভেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারি ১৯০৫, ফেব্রুয়ারি ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫।
১৬. হজরত মওলানা লুৎফুল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ–মার্চ ১৯০৫।
১৭. ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা –মার্চ ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫, জুন ১৯০৫।
১৮. বাইবেলের পবিবর্তন–ডিসেম্বর ১৯০৫।
১৯. হজরত মোহাম্মদ (দ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত, জুলাই ১৯০৬।
২০. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা– নভেম্বর ১৯০৫, মাচ ১৯০৫, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।
২১. চট্টগ্রাম ভ্রমণ– ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
২২. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী–৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
২৩. পশ্চিম ভ্রমণ–৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।
২৪. হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ–পৌষ ১৩১৩।

এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে এই পত্রিকায় মুন্সীজীর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যান্য পত্রপত্রিকা

ইসলাম প্রচারকসহ বিভিন্ন মুসলিম পরিচালিত পত্রপত্রিকায় মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই রচনাগুলো ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। কারণ মুসলিম পরিচালিত পত্রপত্রিকাগুলো আজ

দেশের প্রধান প্রধান লাইব্রেরীতেও তেমন চোখে পড়ে না। কিন্তু হিন্দু লেখকদের পরিচালিত পত্রপত্রিকা এখনো বিভিন্ন লাইব্রেরীতে লক্ষ্য করা যায়। দেশের পুরানো লাইব্রেরী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হিন্দুদের হাতে থাকার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং হিন্দুরা সে সময়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে মুসলমানদের পত্রপত্রিকা বাদ দিয়ে হিন্দুদের সাময়িক পত্রপত্রিকা সংগ্রহে রাখতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর' 'প্রচারক' 'নবনূর' 'কোহিনূর' 'ইসলাম দর্শন' 'বঙ্গনূর' 'শরিয়তে এসলাম' 'তবলীগ' প্রভৃতি পত্রিকায় মুন্সীজীর বেশ কিছু লেখা লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ

১. আসল কোরান কোথায়–খ্রীস্টীয় বান্ধব, জুন ১৮৯২।
২. হজরত বেলাল সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ–কোহিনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩।
৩. হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ–ঐ, পৌষ ১৩১৩।
৪. দার্জ্জিলিং ভ্রমণ–বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬।
৫. মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ–বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।
৬. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (মরুহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ–বঙ্গনূর, আশ্বিন ১৩২৭।
৭. খৃষ্ট ধর্ম রহস্য –ইসলাম দর্শন, ফাল্গুন ১৩২৭।
৮. খ্রীষ্টীয় সমাজে আট বৎসর–শরিয়ত, আষাঢ় ১৩৩২।
৯. স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত –রওশন হেদায়েত, চৈত্র ১৩৩২।
১০. আর্য্য–ভ্রান্তি প্রকাশ শুদ্ধির অসারতা–শরিয়তে এসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪, আষাঢ় ১৩৩৪, শ্রাবণ ১৩৩৪, ভাদ্র ১৩৩৪।
১১. ঈছায়ী ক্রীড়া–শরিয়তে এসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪।

১২. বাইবেল তত্ত্ব–তবলীগ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, মাঘ ১৩৩৪, ফাগুন' ১৩৩৪।

এ ধরনের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা মুন্সীজী এসব পত্র–পত্রিকায় লিখে এদেশীয় মুসলিম সমাজে একজন বলিষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসেবে বহুল পরিচিত ছিলেন। তাঁর এসব রচনায় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক--ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা–দীক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন মুসলিম সমাজকে ইসলামী ইতিহাস–ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্যসহ বিভিন্ন দিকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন এ ধরনের রচনা প্রকাশ করেন। তাঁর এই তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ এবং ইসলামী জাগরণমূলক এসব প্রবন্ধে তৎকালীন মুসলিম বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং দিশেহারা মুসলমান সমাজ সে সব প্রবন্ধ পড়ে নতুন জীবন গড়ে তোলার শক্তি ও সাহস ফিরে পায়।

পাদটীকা

১. আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা ঃ ডঃ কাজী আব্দুল মান্নান, ২য় সংস্করণ, রাজশাহী, পৃ. ২২১।

উপসংহার

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে চিরস্মরণীয় কর্মতৎপরতা ও সাহিত্য-কর্ম তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। যতদিন এদেশে বাঙালি মুসলমানরা বেঁচে থাকবে ততদিন মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে যখন দেশের অসংখ্য মুসলমান খৃস্টানদের প্রলোভনে পড়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে খৃস্টান সমাজভুক্ত হয়ে যাচ্ছিল; ঠিক সে সময় জমিরুদ্দিন ও মুনশী মেহেরউল্লাহ দেশের বিপথগামী মুসলমানদের সুপথে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে তাদের জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। মুসলিম বাংলার নব-জাগরণের ইতিহাসে তাই তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে।

তাঁরা মূলত ইসলাম প্রচারক হলেও মুসলমানদের নিজ ধর্ম গ্রন্থ, তাঁদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ইসলামী বিধি-বিধান, বিধর্মীদের ইসলামের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদে বিভিন্ন রচনা প্রকাশ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁদের এসব রচনা আমাদের সাহিত্যে মুসলমানদের রচিত স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত। মুন্সী জমিরুদ্দিন ও মুনশী মেহেরউল্লাহ এ ধারার উদ্গাতা। তাঁরা যে ধারার সূচনা করেন তা আজ অসংখ্য মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ ছিলেন তৎকালীন সময়ে একজন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল ঘটনাবহুল এবং ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি স্কুলে ছাত্র অবস্থায় খৃস্ট সমাজভুক্ত হন এবং খৃস্ট সমাজে অবস্থান করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মিশনারী হিসেবে বিভিন্ন

স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং পরে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে ফিরে আসেন এবং ইসলামের সেবায় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় ও বই-পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন তাঁর সাহিত্যে অজ্ঞ, নিশ্চুপ, অবহেলিত মুসলমান সমাজকে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে জীবনীমূলক রচনাবলী শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদ, গযল, কবিতা, ভ্রমণ সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক রচনা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক রচনা, বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদ রচিত গ্রন্থাবলীও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ জমিরুদ্দিন নিঃসন্দেহে আমাদের সাহিত্যের একজন শক্তিমান পুরুষ।

তবে একথা সত্য যে, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের এই কর্মতৎপরতা ও সাহিত্যকর্ম আমরা তেমন গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করছি না এবং জীবন ও কর্মের উপর তেমন ভাল গবেষণাও করা হচ্ছে না। তাঁর বংশধররা আজ অর্থাভাবে অতিকষ্টে দিন অতিবাহিত করছে। তাঁর স্মরণে আজও কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। এবং তাঁর কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বিভিন্ন সময়ে স্মরণ করার কোন আয়োজন করা হচ্ছে না। মুসলিম বাংলার এই নিবেদিত প্রাণ পুরুষ জমিরুদ্দিনকে আজ স্মরণ করা অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। তাঁর জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্য রচনা ব্যাপকভাবে প্রচার ও আলোচনা-সমালোচনা দেশ ও জাতির স্বার্থে অতি প্রয়োজনীয় বলে আমরা মনে করি।

পরিশিষ্ট

ক. জমিরুদ্দিনের গাড়াডোব বাহাদুরপুর।

গাড়াডোব বাহাদুরপুর মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন একটি পুরোনো গ্রাম। পাঠান রাজত্ব সময়ে বাহাদুর শাহ নামক একজন দরবেশ এখানে অবস্থান করেন। তাঁর নামানুসারেই গ্রামের নাম বাহাদুরপুর হয়। এ অঞ্চলে আরো কয়েকটি বাহাদুরপুর থাকায় সে সমস্ত গ্রাম থেকে এটিকে পৃথক করার জন্যে তৎকালীন জমিদারগণ এই গ্রামটির নাম গাড়াডোব বাহাদুরপুর রেখেছিলেন। এই গ্রামেই সুধী শেখ জমিরুদ্দিনের জন্ম হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জমিরুদ্দিন ১৩৪৪ সনের ২রা আষাঢ় ইন্তিকাল করেন। তাঁর কবর এই গ্রামেই অবস্থিত। জমিরুদ্দিনের স্মৃতিবিজড়িত এই গাড়াডোব বাহাদুরপুর দেখতে বর্তমানে অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত, উৎসাহী সুধী ব্যক্তি মাঝেমধ্যে আসেন। তাঁরা দূর–দূরান্ত থেকে অনেক আশা নিয়ে গাড়াডোব বাহাদুরপুরে যান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা কিছুই দেখতে পান না। তাঁরা দেখেন নামফলকবিহীন একটি জীর্ণ কবর, বংশধরদের করুণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা। ভাঙ্গা কয়েকটি চালা দেওয়া কুঁড়ে ঘর। তাঁরা শুনে আসেন মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের পৌত্রদের মুখে তাদের দুঃখের কথা, অভাবের কথা। তাঁরা অনেকে আসেন মুন্সীজীর কিছু বইপত্র দেখার বা পাওয়ার আশায় কিন্তু এসে দেখেন বইপত্র কিছুই নেই। তখন কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন বইপত্র কোথায় গেলো? তখন মনোরুদ্দিন মুনশী অথবা তাহেরউদ্দীন মুনশী এসে বলেন, বইপত্র পাবো কোথায় ? দাদা মারা যাওয়ার পর তাঁর বইগুলো গাংনীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 'জামিরিয়া লাইব্রেরী' নামে একটি লাইব্রেরী খুলে বইগুলো

রাখা হয়। তারপর কিছু দিন যেতে না যেতে এ বইগুলোর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাছাড়া কিছু বই বাড়িতে ছিল, তাও নেই। কারণ আমার আব্বা (জামালউদ্দিন মুনশী) বাঘ শিকারী ছিলেন। এ অঞ্চলে তখন বন ছিল। আব্বার সাথে পুলিশ অফিসারদের ভাল সম্পর্ক ছিল। তাদেরকে দাদার বইগুলো দিয়ে দিয়েছেন। আব্বার মুখে শুনেছি দাদার কিছু বই বাংলা একাডেমীতে আছে। সেগুলো ছাপানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ১৯৬৯ সালের ২০শে জুন (পত্রসংখ্যা ৬৮৭৮/বা/এ ২১) বাংলা একাডেমীর সহকারী গবেষণাধ্যক্ষ বদিউজ্জামান আমার আব্বাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের কিছু বই ছাপা হবে এবং রয়্যালটির অংশ হিসেবে ৫০০ টাকা পাঠানো হলো। কিন্তু সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দাদার কোন বই বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে ছাপা হয়নি।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের গাড়াডোব বাহাদুরপুরে গেলে এ সব দৃশ্য চোখে পড়ে। এক কালের দেশ কাঁপানো ব্যক্তিদের পরবর্তী বংশধরদের এই অবস্থা দেখে দুঃখ লাগে। অভাবগ্রস্ত মুন্সীজীর বংশধরদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

শেখ বাকেরউদ্দীন

শেখ আমিরুদ্দিন

মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ

ক.

১. আইজুদ্দীন

২. নূরজাহান (রাজশাহী)

খ.

১. জামালউদ্দীন

২. গিয়াসউদ্দীন

৩. গহরজান–দলিয়ারপুর

৪. কমলজান বেতাই১ গাড়াডোব২ বেতাই

৫. মনি (বিয়ের পূর্বে মারা যায়)

(খ) ১. গহবরজান

পুত্র ভ্যাটা

খ) ৪. কমলজান

১. কহিনূর–রাজনগর

২. বানু–পিরোজপুর

৩. জাহানারা– পশ্চিমবঙ্গ

খ) ১. জামালউদ্দীন

১. তাহের উদ্দীন (আবু তাহের) চায়ের দোকান

২. তহিউদ্দীন

৩. মনোরুদ্দিন–রিকশাচালক

খ) ২. গিয়াস উদ্দীন

১. সিরাজউদ্দীন

২. দিরাজউদ্দীন[১]

এ দেশীয় মুসলমানদের ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। আর তাঁর বংশধররা আজ মানবেতর পর্যায়ে জীবন যাপন করছে। কেউ রিকশা চালায়, কেহবা লাঙ্গল ঠেলে, আবার কেউবা ছোট–খাটো পান–তামাক অথবা চায়ের দোকান দিয়ে অতিকষ্টে সংসার চালানোর চেষ্টা করে। তাদের দেখলে

মনে হয় না যে, তারা জমিরুদ্দিনের বংশধর। গাড়াডোব বাহাদুরপুরে মুন্সীজীর আত্মীয়-স্বজনের এই অবস্থা আমাদের ভাবিয়ে তোলে।

আজ পর্যন্ত মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিনের স্মৃতিকে তুলে ধরার জন্যে তেমন কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নি। দীর্ঘদিন মুন্সীজীর ভাঙ্গা বাড়িটি সংস্কার করা হয়নি। তাঁর কবরটি আজও ভালভাবে বাঁধানো হয়নি। কবরটির এ অবস্থা দেখে অনেক ঐতিহাসিক, পণ্ডিত ও সুধী ব্যক্তি দুঃখ করেছেন। কবরটি আজ ভগ্নপ্রায়, নাম-ফলকহীন। কবরটি দেখলে কারো ধারণা হবে না যে, মুসলিম বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন এখানেই চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।

পাদটীকা

১. জমিরুদ্দিনের নিকট আত্মীয়-স্বজন ও গাড়াডোব বাহাদুরপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক বংশধর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ. জমিরুদ্দিনের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা

গ্রন্থ

১. আসল বাঙ্গালা গজল প্রথম প্রকাশ ১৩১৫ সন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ, নবম সংস্করণ ১৩২০ সন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ, নদীয়া, প্রকাশক মোহাম্মদ জালালুদ্দীন।

২. আসল বাইবেল কোথায়? ১৩২৭ সন, পৃষ্ঠা ৫ (১৫টি প্রশ্নের সংকলন)।

৩. আসল হুলিয়ানামা, পঞ্চম সংস্করণ, গাড়াডোব, কুষ্টিয়া, প্রকাশক মুন্সী জামাল উদ্দীন মিয়া, ১৩৮৪ সন।

৪. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, প্রথম প্রকাশ ১৩০৪ সন, (নতুন সংস্করণ) রাজশাহী, ১৯৬৭, সম্পাদনা- মুহাম্মদ আবূ তালিব ও ডাঃ গোলাম মোয়াযযম।

৫. ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দ) ও পাদ্রী বাউস সাহেবের সাক্ষ্য, নদীয়া, প্রকাশক গ্রন্থকার, ১৩৩২ সন, ১৯২৫ খৃঃ (রদ্দে–২)।
৬. ইসলামী বক্তৃতা, প্রথম প্রকাশ ১৩১৪ সন, ১৯০১ খৃঃ, পৃষ্ঠা ৫৫, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৭ সন, তৃতীয় সংস্করণ ১৩২২ সন, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩২ সন, নদীয়া, প্রকাশক শেখ আজিজুদ্দীন।
৭. ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য, প্রথম প্রকাশ–১৩০৭ সন, ১৯০০ খৃঃ, তৃতীয় সংস্করণ, নদীয়া, প্রকাশিকা নূরজাহান খাতুন ১৩১৯, পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৬ খৃঃ।
৮. ইসলামের সভ্যতা (?)
৯. উপদেশ ভাণ্ডার (?)
১০. কোথা চলি গেলে (কবিতা গ্রন্থ) পৃঃ ৫, ১৩০৮ সন।
১১. Glory of Islam, 1st Edition 1929.
১২. খোশ গল্প (?)
১৩. জওয়াবান্নাছায়া (?)
১৪. গৌড়ের ইতিহাস (?)
১৫. পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন ; নদীয়া; মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন ১৩৩৪, ১৯২৭ খৃঃ (রদ্দে–৭)।
১৬. পেশ খবর (?)
১৭. বিশুদ্ধ খতনামা, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৩৪ সন, (পৃ. ৩৬) মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স।
১৮. মেহের চরিত ঃ কলিকাতা; রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩১৫।
১৯. দুই শত উপদেশ (?)
২০. রদ্দেনাছারা, ৩য় সংস্করণ; ১৩৩৩ সন, সম্পাদনা–মুন্সী জমিরুদ্দিন আহমদ।

২১. রদ্দে সত্য ধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলাম, নদীয়া প্রকাশক-গ্রন্থকার ১৩৩২, ১৯২৫ খৃঃ (রদ্দে–৩)
২২. মাসুম মোস্তফা (দ.) (রদ্দে–৯)
২৩. হযরত ইসহাক (?)
২৪. হযরত ঈসা কে? প্রথম প্রকাশ ১৮৯১ খৃঃ, চতুর্থ সংস্করণ ১৩৩৩ সন, ১৯২৬ খৃঃ (রদ্দে–৪) কলকাতা, প্রকাশক-শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন।
২৫. হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশ খবর (পৃঃ ১২)
২৬. শোকানল, নদীয়া, প্রথম প্রকাশ ১৩১৬, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৩ সন (পৃ. ২৪)।
২৭. শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দ.) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন, প্রকাশক-জয়নাল আবেদীন, ১৩২৩ সন, ১৯১৬ খৃঃ (পৃ. দ+৯৮)

প্রবন্ধ

১. আসল কোরান কোথায় ? খৃস্টান বান্ধব, জুন ১৮৯২ খৃঃ।
২. আর্য্য ভ্রান্তি প্রকাশ বা শুদ্ধির অসারতা,শরিয়তে এসলাম, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩৩৪।
৩. ইসলাম সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজের বক্তৃতা, ইসলাম প্রচারক ৬ষ্ঠ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯০৫ খৃঃ।
৪. ইসলাম সম্বন্ধে টেলার সাহেবের বক্তৃতা, ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯০৪ খৃঃ।
৫. ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা, ইসলাম প্রচারক ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম–২য় সংস্করণ, মে–জুন, ১৯০৪ খৃঃ।
৬. ঈছায়ী ক্রীড়া, শরিয়তে এসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭।
৭. খৃস্ট ধর্ম রহস্য, ইসলাম দর্শন, ফাল্গুন, ১৩২৭ সন।

৮. খ্রীস্টীয় সমাজে আট বৎসর, শরিয়ত, আষাঢ় ১৩৩২।
৯. চট্টগ্রাম ভ্রমণ, ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।
১০. দার্জ্জিলিং ভ্রমণ, বাসনা, বৈশাখ ১৩১৬ সন।
১১. পারস্য কবিদের বিবরণ, ইসলাম প্রচারক, চতুর্থ সংখ্যা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১।
১২. প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে? ঐ
১৩. ফারাক্লিত (ইংরেজি হইতে অনূদিত) ঐ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩।
১৪. বাইবেল আপনি আমার বিরুদ্ধে, ইসলাম প্রচারক, জুলাই ১৮৯৯ খৃঃ।
১৫. বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা, ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, জানুয়ারি-১৯০০, মার্চ-এপ্রিল-১৯০০, মে-জুন-১৯০০ খৃঃ।
১৬. বার্ণবার ইঞ্জিল, ইসলাম প্রচারক, জুন ১৯০৫ খৃঃ।
১৭. বাইবেল তত্ত্ব, তবলীগ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪, মাঘ ১৩৩৪ সন, ফাল্গুন ১৩৩৪ সন।
১৮. বাইবেলে বহু বিবাহ, ইসলাম প্রচারক, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩০৬ সন।
১৯. পশ্চিম ভ্রমণ, ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা।
২০. মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, অক্টোবর ১৯০৪ খৃঃ।
২১. প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কে? 'ঐ' ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩০৬ সন।
২২. মৌলবী নৈমুদ্দীন সাহেবের জীবনী, ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯০১ খৃঃ।
২৩. মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ আত্যাচার' ঐ, ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০ সন।

২৪. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ঐ, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

২৫. টমাস কার্লাইল ও ইসলাম, ইসলাম প্রচারক, মার্চ–এপ্রিল, ১৯০৯ খৃঃ।

২৬. বাইবেল পরিবর্তন, ঐ, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯০৫ খৃঃ।

২৭. মুর্শিদাবাদ ও পলাশী ভ্রমণ, বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬ সন।

২৮. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ (সিরাজগঞ্জ নিবাসী মুনশী মেহেরুল্লা) মরহুম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, বঙ্গনূর আশ্বিন ১৩২৭ সন।

২৯. স্বামী সদানন্দের শয়তানি ও ইসলামে ভীষণ আঘাত, রওশন হেদায়েত, চৈত্র ১৩৩২ সন।

৩০. হযরত মওলানা লুৎফুল হক সাহেব (মরহুম) সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, ইসলাম প্রচারক, ৬ষ্ঠ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, মার্চ ১৯০৫ খৃঃ।

৩১. হযরত মোহাম্মদের (দ.) সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য, ঐ নভেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৪, ফেব্রুয়ারী ১৯০৫, এপ্রিল ১৯০৫ খৃঃ।

৩২. হজরত মোহাম্মদ (দ.) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, ঐ, জুলাই ১৯০৫, নভেম্বর ১৯০৫, মার্চ ১৯০৬, ৮ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

৩৩. হজরত মোহাম্মদ বোখারী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ, ইসলাম প্রচারক, পৌষ ১৩১৬ সন।

৩৪. শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ জীবনী, ঐ, নভেম্বর–ডিসেম্বর ১৯০১ খৃঃ।

শেখ জমিরুদ্দিনের জীবন-পঞ্জী

সন তারিখ	ঘটনাবলী
১৫. মাঘ ১২৭৭/১৮৭০	জমিরুদ্দিনের জন্ম
১২৮২/১৮৭৫	গ্রামের মক্তবে ভর্তি
১২৮৬/১৮৭৯	আমঝুপি স্কুলে ভর্তি এবং পরে বঙ্গ বিদ্যালয ও মেহেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি।
১২৯৩/১৮৮৫	কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি।
২৫ ডিসেম্বর রোববার ১৮৮৭/১২৯৫	খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ
/১৮৯২	H. G. R. ডিগ্রী লাভ ও মিশনারী হিসেবে প্রথমে এলাহাবাদ ও কলকাতায় কাজ এবং শেষে নদীয়ার শিকারপুরে অবস্থান
১২৯৯/জুন ১৮৯২	'আসল কোরান কোথায়' প্রবন্ধ প্রকাশ।
চৈত্র ১২৯৯, বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৩০০	জমিরুদ্দিনের প্রবন্ধের উত্তরে মেহেরউল্লাহ্‌র প্রবন্ধ প্রকাশ।
/১৮৯২	কুষ্টিয়ায় খৃস্ট সমাজের সভায় জমিরুদ্দিনের বক্তব্য প্রদান ও সভা শেষে ফেরার পথে সূরা সফের পাঠ ও ইসলাম ধর্মে আগ্রহ প্রকাশ।
/১৮৯৫	আবার ইসলাম ধর্মে আগমন।
/১৩০৪	রেয়াজউদ্দীন আহমদের সাথে আলাপ।

৬—

১১ ফাল্গুন ১৩০৪/	মেহেরুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ
১৩০৪/	'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' প্রকাশ।
১৩০৫/	নোয়াখালিতে বিশাল ধর্মসভায় বক্তৃতা প্রদান।
১৩০৭/১৯০০	'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পর ধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' প্রকাশ।
১৩০৮/	কোথা চলি গেলে (কবিতাগ্রন্থ) প্রকাশ।
১৩১০/	বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে সদস্য নির্বাচিত।
১৩১৩/	ঢাকায় নিখিল ভারতে মুসলমান।
১৩১৪/১৯০৭	ইসলামী বক্তৃতা প্রকাশ।
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪/৭ জুন ১৯০৭	মেহেরুল্লাহর ইন্তিকাল।
১৩১৪/	করাচীতে অনুষ্ঠিত মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের অধিবেশনে তাঁর যোগদান।
১৩১৫/১৯০৮	'আসল বাঙ্গালা গজল' প্রকাশ।
১৩১৫/১৯০৮	মেহের চরিত প্রকাশ।
৭ মার্চ ১৯১৩	তাঁর কাজে প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ প্রশংসাপত্র প্রদান।
১৪ জানুয়ারী ১৯১৫	তাঁর কাজে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশংসাপত্র প্রদান।

১৩২৩/১৯১৬	'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দ.) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন' প্রকাশ।
১৩৩২/১৯২৫	'রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলাম' প্রকাশ।
১৩৩৪/	'পাদ্রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' গ্রন্থ প্রকাশ।
১৯২৯	Glory of Islam প্রকাশ।
১ আষাঢ় ১৩৪৪	জমিরুদ্দিনের ইন্তিকাল।

তথ্যপঞ্জী

বই

১. আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য অক্টোবর ১৯৬৪, ঢাকা।

২. ঐ মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, ঢাকা, ১৩৭৬।

৩. আজহার ইসলাম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ)

৪. আবূ তালিব, মুহাম্মদ ঃ মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ দেশ-কাল–সমাজ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, ঢাকা।

৫. ঐ (ডা. মুহাম্মদ গোলাম মোয়াযযমের সহায়তায়) রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দিনের ইসলাম গ্রহণ (সম্পাদিত) রাজশাহী ১৯৬৭।

৬. আবদুল হাই, মুহম্মদ ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা, ১৯৫৬

৭. ওয়াকিল আহমদ ঃ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা–চেতনার ধারা (প্রথম খন্ড) এপ্রিল, ১৯৮৩ ঢাকা।

৮. এনামুল হক, ড. মুহাম্মদ ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৫ সাল।

৯. কাজী আবদুল মান্নান, ডঃ ঃ আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় সংস্করণ, রাজশাহী।

১০. কাজী দীন মুহাম্মদ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড।

১১. মুনসুর উদ্দীন, মুহম্মদ ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা (দ্বিতীয় খণ্ড) পঁচিশে বৈশাখ, ১৩৭১, ঢাকা।

১২. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম ঃ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, অক্টোবর ১৯৬৪, ঢাকা।
১৩. ঐ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৭।
১৪. মুনশী মনিরুদ্দিন আহমদ ঃ রদ্দেনাছারা, ৩য় সংস্করণ, ১৩৩৩ সন।
১৫. Rev. Moulana Zamiruddin : Glory of Islam B. T. H. 1st Ed. 1929.
১৬. হাবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন ঃ কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ, কলিকাতা, ১৯৩৪ সাল।

প্রবন্ধ

১. আনিসুজ্জামান ঃ মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দিন সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৭ সন।
২. আনছার-উল হক ঃ মুনশী জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ, প্রবাহ, ২য় সংখ্যা, ১৮ আক্টোবর, মেহেরপুর।
৩. গোলাম সাক্‌লায়েন ঃ উত্তর বঙ্গের একটি মূল্যবান গ্রন্থাগার, মাহেনও, জানুয়ারী ১৯৬৯।
৪. মুহম্মদ রবীউল আলম ঃ বাংলা সাহিত্যে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ, ৩ মার্চ, ১৯৮৫, সচিত্র বাংলাদেশ।
৫. ঐ ইসলামী সাহিত্য ও মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন, ২ ও ৯ নভেম্বর ১৯৮৪ দৈনিক বার্তা।

৬. ঐ মুসলিম রেনেসাঁ ও অন্তরঙ্গ দুই বন্ধুর কথা, দৈনিক বার্তা, ৭ জানুয়ারি '৮৫।

৭. ঐ মুসলিম বাংলার দুই বন্ধু, ময়ূর পঙ্খী, মার্চ ১৯৮৫, রাজশাহী।

ইফাবা—৯৩-৯৪—প্র/৬১৮৬ (উ)—৩২৫০